আর কত খুন হবে বাংলাদেশে?

—পৃঃ ...২৯

দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

নারকেল বীথির নিচে প্রাচীন শহর

—পৃঃ ...১৬

৬৮ বর্ষ, ৪৩ সংখ্যা।। ১১ জুলাই ২০১৬।। ২৬ জ্যৈষ্ঠ - ১৪২৩।। যুগাব্দ ৫১১৮।। website : www.eswastika.com ।।

হরপ্পা সভ্যতার আদি পর্বের সন্ধান

স্বস্তিকা

।। কলকাতা ও আগরতলা থেকে একযোগে প্রকাশিত বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৬৮ বর্ষ ৪৩ সংখ্যা, ২৬ আষাঢ়, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ

১১ জুলাই - ২০১৬, যুগাব্দ - ৫১১৮,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : নবকুমার ভট্টাচার্য, সুকেশ মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.-

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫
E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন ▯ ৬-৮

খোলা চিঠি : হিন্দুদের বধ্যভূমি বাংলাদেশ ▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ৯

জেহাদি সন্ত্রাস এখন কলকাতার দোরগড়ায় ▯ গূঢ়পুরুষ ▯ ১০

ক্রমবর্ধমান অনুৎপাদক সম্পদ জাতীয় অর্থনীতির নিঃশব্দ ঘাতক ▯ অম্লানকুসুম ঘোষ ▯ ১১

বিজ্ঞানের স্পর্শে ইতিহাসের শাপমুক্তি : সরস্বতীর তীরে হরপ্পার আদিপর্বের সন্ধান ▯ সন্দীপ চক্রবর্তী ▯ ১৩

ইতিহাসের হারানো যোগসূত্র : নারকেল বীথির নীচে প্রাচীন শহর ▯ ১৬

পুরাকীর্তির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন শুশুনিয়া ▯ বিপ্লব বরাট ▯ ২১

কাজী নজরুল ইসলাম ও শ্যামাসঙ্গীত ▯ সুদীপ্ত কর ▯ ২২

নৃত্যস্রষ্টা নটরাজ ▯ অমিত ঘোষ দস্তিদার ▯ ২৩

দেশের প্রচলিত আইনগুলিকে সময়োপযোগী করতে বেশ কিছু কাটছাঁট দরকার ▯ বসুন্ধরা রাজে ▯ ২৭

প্রতিবাদী থেকে মুক্তমনা মানুষ আর কত খুন হবেন বাংলাদেশে? ▯ বরুণ দাস ▯ ২৯

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯-২০ ▯ **নবাঙ্কুর : ২৪-২৫** ▯ **অঙ্গনা : ২৬** ▯
অন্যরকম : ৩৩ ▯ **সমাবেশ-সমাচার : ৩৫-৩৮**
▯ **খেলা : ৩৯** ▯ **শব্দরূপ : ৪০** ▯ **চিত্রকথা : ৪১** ▯
প্রাসঙ্গিকী : ৪২

প্রকাশিত হবে
১৮ জুলাই, '১৬

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
১৮ জুলাই, '১৬

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

বিশ্বজুড়ে সন্ত্রাস : আর কত ঝরবে রক্ত ?

বিশ্বজুড়ে চলেছে সন্ত্রাসের তাণ্ডব। আজ ফ্রান্স তো কাল তুরস্ক কিংবা বাংলাদেশ। প্রায় গত তিন দশক ধরে অবিচ্ছিন্নভাবে চলেছে এই তাণ্ডব। আমাদের দেশে গণতন্ত্রের সর্বোচ্চ পীঠস্থান সংসদের উপরেও হয়েছে সন্ত্রাসীদের আক্রমণ। এই নিয়েই এবারের বিষয়। লিখেছেন মে: জে: কে কে গাঙ্গুলি, অমলেশ মিশ্র, সাধন কুমার পাল প্রমুখ।

দাম একই থাকছে - ১০ টাকা।

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন,
বোলপুর,
মোবাইল -
৯২৩২৪০৯০৮৫

সানরাইজ®

শাহী গরম মশলা

SUNRISE PURE

রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

শিয়রে শমন

বিশ্ব যে ইসলামিক সন্ত্রাসবাদ নামক আগ্নেয়গিরির উপর বসিয়া রহিয়াছে তাহা লইয়া সন্দেহের তিলমাত্র অবকাশ ছিল না। তাহা সত্ত্বেও অনেক দেশজ উদারপন্থী, সেকুলারবাদী দেশবাসীকে আশ্বস্ত করিয়াছিলেন এই বলিয়া যে আগ্নেয়গিরিটি সুপ্ত, অগ্ন্যুৎপাতের সম্ভাবনা নাই। ইস্তানবুল কিংবা বাংলাদেশের ঢাকার গুলশনে সাম্প্রতিকতম তাণ্ডবলীলার পর মনে হইতেছে হয় ইহাদের বোধশক্তি লুপ্ত হইয়াছিল কিংবা তাহা শয়তানের পদে সমর্পিত। সন্ত্রাসবাদের কোনো ধর্ম হয় না বলিয়া যাঁহারা এত কাণ্ডের পরেও জিগির তুলিতেছেন, অথচ ধর্মীয় সন্ত্রাসবাদ যেভাবে বিশ্বমানবতাকে ভূ-লুণ্ঠিত করিল তাহার সম্পর্কে তাঁহাদের টুঁ শব্দটি বাহির হইতেছে না। আফজল গুরু কিংবা মকবুল ভাটের মতো সন্ত্রাসবাদী যাঁহাদের কাছে পূজ্য, ভারতের সংবিধান মোতাবেক সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে দোষী সাব্যস্ত হইয়া ফাঁসি যাওয়া আফজলের মৃত্যুবার্ষিকী পালন যাঁহাদের নিকট বাক্‌স্বাধীনতা, ভারত-বিরোধিতাই যাঁহাদের নিকট প্রগতিশীলতা, তাঁহারা যে মানবতার কত বৃহৎ শত্রু হইতে পারে বিশ্বের হাড়-হিম করা সন্ত্রাসবাদী ঘটনাগুলিই তাহার প্রমাণ।

গোটা বিশ্বই আজ সন্ত্রাস-কবলিত হইলেও ভারতবর্ষের বিপদটি কিছু বেশি। কারণ এদেশে ঘরের শত্রুরা যথেষ্টই প্রভাবশালী। এই সহস্রাব্দের গোড়াতেই সন্ত্রাসবাদের থাবা আমেরিকার উপর পড়িয়াছিল। তাহার সমুচিত জবাব দিতে আমেরিকা বিলম্ব করে নাই। ফ্রান্স আক্রান্ত হইয়াছে, কিন্তু নিজেকে রক্ষা করিবার কৌশল তাহার জানা। ভারত-বিরোধী সন্ত্রাসবাদের নীরব মদতদাতা চীন। কিন্তু সেইদেশও নিজেকে সুরক্ষিত রাখিয়াছে। বড় দুর্ভাগা হইল ভারত। তাহার খাইয়া, তাহার পরিয়া একদল লোক তাহারই দন্তের গোড়া ভাঙিতে উদ্যত। ইহাদের নিকট পারমাণবিক রসদ সরবরাহকারী গোষ্ঠীর সদস্যপদ চাওয়া ভারতের বৈদেশিক নীতির 'বিকৃতি' ও 'সংকীর্ণতা'। সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতায় ইহারা মুখর, কিন্তু সন্ত্রাসবাদের বিরোধিতায় নীরব। নিকারাগুয়ায় বাজ পড়িলে ইহাদের মস্তিষ্কে বজ্রাঘাত হয়। কিন্তু বাংলাদেশে রামকৃষ্ণ মিশনকে জেহাদি হামলার হুমকি শুনিতে হইলে, কিংবা গত কয়েক মাসে সেদেশে একের পর এক হিন্দু পুরোহিত ও সেবায়েতকে আক্রান্ত ও নিহত হইতে দেখিলেও ইহারা মূক ও বধির সাজিয়া থাকে।

সুতরাং শমন আমাদের শিয়রেই। ঢাকায় সন্ত্রাসবাদীদের মর্মান্তিক হামলার পরে প্রকাশ্যে আসিয়াছে আইসিসের বাংলাদেশের জন্য গঠিত সেনাবাহিনী 'আমির ই খিলাফা'র অন্যতম সেনাপতি শেখ আবু ইব্রাহিম আল হানিফের পরিকল্পনা। যাহাতে স্পষ্ট ভারতের পূর্বপ্রান্ত অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ, অসম, ত্রিপুরা ইত্যাদি রাজ্যের সীমান্তবর্তী এলাকায় পরিকল্পিত নাশকতা চালাইয়া সিরিয়ার রাকার ন্যায় মুক্তাঞ্চল গঠন করিবার চেষ্টা হইবে। অসমে জাতীয়তাবাদী সরকার অধিষ্ঠিত রহিয়াছে, সুতরাং সন্ত্রাস দমনে তাহারা কঠোর হইবে এ আশা করাই যায়। এমতো পরিস্থিতিতে পশিমচমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সংখ্যালঘু তোষণের নীতি ছাড়িলেই রাজ্যের মঙ্গল, নচেৎ বিপদ অনিবার্য। শক্ত গেরো ত্রিপুরায়। তথায় প্রশাসনিক ক্ষমতা দেশদ্রোহিতার রক্তবীজেদের হস্তে রহিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে তাহারা প্রায় নিশ্চিহ্ন হইলেও তাদের পৃষ্ঠপোষক বুদ্ধিজীবীকুল আজও এ রাজ্যে সক্রিয় ও শক্তিশালী। তাহাদের দুর্বুদ্ধিকে কঠোর-হস্তে মোকাবিলার উপরই নির্ভর করিতেছে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ভারতের সাফল্য।

পুনশ্চ, সম্প্রতি ব্রেক্সিটের সাফল্যে অত্যুৎসাহিত ভারতীয় রাজনীতিতে এক অর্বাচীন গণভোটের দাবি তুলিয়াছে। আমাদের বিশ্বাস এই দাবির উত্থাপন ভারতবর্ষের অখণ্ডতাকে বিপন্ন করিবার স্বার্থেই। তাহা হইলে এদেশে আইসিসের বন্ধুবর্গ তথা মানবতার শত্রুদের সংখ্যাও যে ক্রমাগতই বৃদ্ধি পাইবে তাহা বলাই বাহুল্য। সুতরাং ইহাদেরও কঠোর হস্তে মোকাবিলা করিবার প্রয়োজন।

সুভাষিতম্

আ-সিন্ধু সিন্ধুপর্যন্তা যস্য ভারতভূমিকা।
পিতৃভূঃ পুণ্যভূশ্চৈব স বৈ হিন্দুরিতি স্মৃতঃ।। (সাভারকর)
সিন্ধু থেকে সমুদ্র পর্যন্ত যাঁরা ভারতভূমিকে পিতৃভূমি, পুণ্যভূমি বলে মনে করেন তাঁরা হিন্দু নামে পরিচিত।

বাংলাদেশে হিন্দুদের বিরুদ্ধে শাসকদল, বিরোধীদল ও মৌলবাদী গোষ্ঠী সমান

ঢাকা থেকে বিশেষ প্রতিনিধি।। হিন্দুয়ানি ও নাস্তিক্যবাদী শিক্ষা চলবে না ৯৮ শতাংশ মুসলমানের দেশে। নাস্তিক্যবাদী ও হিন্দুত্ববাদী পাঠ্যসূচি, কুফরি শিক্ষা আইন অবিলম্বে বাতিল করতে হবে। বাজেটে হিন্দুদের জন্য ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করে সরকার ইসলামবিরোধী কাজ করেছে। এ বক্তব্য জামায়াতে ইসলামি, ইসলামি ঐক্যজোট (যারা তালেবান বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করার জন্যে বদ্ধপরিকর), নিষিদ্ধ জামাআতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশ (জেএমবি) কিংবা হরকাতুল জিহাদের নয়, খোদ মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী ক্ষমতাসীন 'ধর্মনিরপেক্ষ' আওয়ামি লিগের অঙ্গ সংগঠন বলে দাবি করা আওয়ামি ওলামা লিগের। ওলামা লিগ নেতারা বলেন, ওলামা লিগ আওয়ামি লিগের অঙ্গ সংগঠন। আওয়ামি লিগের অন্তত দুজন নেতা বলেছেন, ওলামা লিগের সঙ্গে আওয়ামি লিগের কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, ওলামা লিগের মানববন্ধন ও সমাবেশে আওয়ামি লিগের কিছু নেতা নিয়মিত উপস্থিত থাকেন। ওলামা লিগের অফিসও বঙ্গবন্ধু এভেনিউতে অবস্থিত আওয়ামি লিগের প্রধান কার্যালয়ে। তৃতীয় তলায় ওলামা লিগের নামফলক জ্বলজ্বল করছে। এই ভবনে আওয়ামি লিগের বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনের অফিসও রয়েছে। এখানে নিজস্ব অফিসে বসেই ওলামা লিগ নেতারা সংগঠনের সভা করেন, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চালান। আওয়ামি লিগ কার্যালয়ের সামনেই সমাবেশ করেন।

গত বছর প্রধান বিচারপতি হিসেবে বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহা দায়িত্ব গ্রহণের পর ওলামা লিগ তাঁকে অপসারণের দাবিতে সমাবেশ করেছিল। তাদের বক্তব্য ছিল, মুসলমান প্রধান বাংলাদেশে কোনো হিন্দু প্রধান বিচারপতি হতে পারেন না। তাই অবিলম্বে সুরেন্দ্র কুমার সিনহাকে সরিয়ে দিতে হবে। গত ৪ ডিসেম্বর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খৃষ্টান ঐক্য পরিষদ আয়োজিত লক্ষাধিক লোকের সমাবেশে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের সম-অধিকার ও সম-মর্যাদার ৭ দফা দাবি গৃহীত হওয়ার পর এই সংগঠনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা ও এই সংগঠনের অন্যতম উপদেষ্টা ও সাংসদ সুরঞ্জিত সেনগুপ্তকে আওয়ামি লিগের উপদেষ্টা পরিষদ থেকে বহিষ্কারের দাবি জানিয়েছিল। সুরঞ্জিতের অপরাধ এই সাতদফা দাবি মেনে নেওয়ার জন্যে সরকারকে সময়সীমা বেঁধে দিয়েছিলেন। ওলামা লিগ সরকারের বিভিন্ন দপ্তর ও প্রতিষ্ঠানে সংখ্যালঘু বিশেষ করে হিন্দু তোষণের অভিযোগও উত্থাপন করেছে। গত পয়লা বৈশাখের আগে বর্ষবরণ উৎসবকে ইসলামবিরোধী আখ্যায়িত করেছিলেন ওলামা লিগ নেতারা। ওলামা লিগ নববর্ষ উৎসবকে হিন্দু সংস্কৃতির অংশ মনে করে।

ওলামা লিগ তাদের ভাষায় হিন্দুত্ববাদী শিক্ষানীতি বাতিলের দাবিই শুধু করেনি, বাংলাদেশে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যবই থেকে রবীন্দ্রনাথ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রামমোহন রায়, শরৎচন্দ্র, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়সহ সব হিন্দু লেখকদের লেখাও বাদ দেওয়ার দাবি জানিয়েছে। ঠিক এমন দাবি তুলেছিল হেফাজতে ইসলাম বছর চারেক আগে, তাদের ১৩ দফা দাবিতে। এই ১৩ দফায় হিন্দুদের পুজোআচ্চা বন্ধ করা ও মূর্তিনির্মাণ নিষিদ্ধ করার দাবি জানানো হয়েছিল। বলা হয়েছিল অ-মুসলমানদেরও পর্দাপ্রথা মানতে হবে। সেই হেফাজতে ইসলামের সঙ্গেও এখন সরকারের অত্যন্ত সুসম্পর্ক।

অন্যদিকে, আরেকটি ইসলামি দল ইসলামি আন্দোলন বাংলাদেশের আমির মুফতি সৈয়দ মোহাম্মদ রেজাউল করিম পির সাহেব চরমোনাই বলেন, বর্তমান পাঠ্যসূচি থেকে নবি রসুল ও সাহাবায়ে কেরামগণের জীবনচরিত বাদ দিয়ে রামকৃষ্ণ ও রামায়ণের ইতিহাস সংযোজন করা হয়েছে যা ৯২ শতাংশ মুসলমানের বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্র। তিনি বলেন, গোরুকে মা সম্বোধন করে কোমলমতি শিশুদের হিন্দুত্ববাদ শেখানো হচ্ছে। এভাবে সরকারের ছত্রছায়ায় মুসলমানিত্ব ধ্বংস করে হিন্দুত্ববাদ প্রতিষ্ঠার ষড়যন্ত্র চলছে। পির সাহেব চরমোনাই আরো বলেন, শিক্ষা আইন, শিক্ষানীতির মাধ্যমে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে হিন্দুত্ববাদের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এসব অবিলম্বে বাতিল না করলে কঠোর আন্দোলন গড়ে উঠলে সরকারকেই দায়ভার গ্রহণ করতে হবে। এই সংগঠনের সঙ্গেও আওয়ামি লিগ নেতাদের অনেকের যোগাযোগ রয়েছে।

আওয়ামি লিগের শীর্ষস্থানীয় নেতারা প্রতিদিনই বক্তৃতা- বিবৃতিতে দেশজুড়ে জঙ্গি হানার জন্যে জামায়েতে ইসলামিকে দায়ী করছেন। জামায়াতকে নিষিদ্ধ ঘোষণার প্রস্তুতির কথাও বলা হয়েছে। যুদ্ধাপরাধী জামায়াতের শীর্ষ নেতাদের অনেকের ফাঁসি হয়েছে। কেউ কেউ ফাঁসির প্রহর গুনছেন। কিন্তু আবার দেশের বিভিন্ন স্থানে জামায়াত নেতাদের আওয়ামি লিগে টেনে নেওয়া হচ্ছে। মাঝে-মধ্যেই খবর হচ্ছে, জামায়াত নেতাদের আওয়ামি লিগে টেনে নেওয়া হচ্ছে। মাঝে-মধ্যেই খবর হচ্ছে, জামায়াত নেতারা আওয়ামি লিগে যোগ দিচ্ছে, আওয়ামি লিগ নেতৃবৃন্দ ও সাংসদরা তাদের ফুল দিয়ে দলে বরণ করছেন। এসব প্রশ্নের কোনো জবাব মিলছে না। ▮

মনরেগা প্রকল্পে বিপুল সাফল্য কেন্দ্রের

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ইউপিএ আমলে মনরেগা (মহাত্মা গান্ধী ন্যাশনাল রুরাল এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি আইন) প্রকল্পের যে চূড়ান্ত অবনতি হয়েছিল অবশেষে তা থেকে মুক্তির দিশা দেখাল বর্তমান এনডিএ সরকার। গত ২৮ জুন কেন্দ্রের গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী বীরেন্দর সিং নয়াদিল্লীতে বিভিন্ন রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রীদের নিয়ে আয়োজিত 'পারফরম্যান্স, ইনিশিয়েটিভস অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিস ফর ইয়ার ২০১৫-১৬ অ্যান্ড ফর ইয়ার ২০১৬-১৭' শীর্ষক এক আলোচনা- চক্রে তথ্য-পরিসংখ্যান উল্লেখ করে জানান— ইউপিএ আমলে মনরেগা প্রকল্পে ব্যক্তি-দিনের সংখ্যা যেখানে ২১২ কোটি থেকে কমে ১৫৩ কোটিতে গিয়ে ঠেকেছিল, বর্তমান জমানায় তা ছুঁয়ে ফেলেছে এযাবৎকালের সর্বোচ্চ বৃদ্ধি ২৩৫ কোটি। স্বভাবতই গ্রামীণ অর্থনীতির ক্ষেত্রে একে নরেন্দ্র মোদী সরকারের বিপুল সাফল্য হিসেবেই দেখছে তথ্যাভিজ্ঞ মহল।

কিন্তু এই বিপুল সাফল্য এল কীভাবে? গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের মতে, ইউপিএ আমলে পেমেন্টে দেরি, মিথ্যা প্রতিশ্রুতি ইত্যাদি কারণে গ্রামীণ মানুষ এই রোজগার প্রকল্পে উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছিলেন। এছাড়া ইউপিএ আমলের সার্বিক দুর্নীতির হাত থেকেও এই প্রকল্প রেহাই পায়নি। এনডিএ ক্ষমতায় এসেই প্রকল্পটিকে যথেষ্ট স্বচ্ছ করবার চেষ্টা করে। যার মধ্যে অন্যতম পদক্ষেপ হলো আধার কার্ডের মাধ্যমে মনরেগা প্রকল্পের উপভোক্তাদের জবকার্ড তৈরি করা, ইলেকট্রনিক ফান্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের মাধ্যমে এদের জন্য প্রকল্পের তহবিল নির্মাণ ইত্যাদি।

একইসঙ্গে মনরেগা প্রকল্পের বাজেট বৃদ্ধির দিকেও নজর দেয় সরকার। শুধু বাজেট বৃদ্ধিই নয়, বাজেটের অতিরিক্ত অর্থ খরচেও অসম্মতি জানায়নি সরকার। যেমন মনরেগা প্রকল্পে এযাবৎকালের সর্বোচ্চ বাজেট ধার্য হয়েছিল গত অর্থবর্ষেই, ৩৭ হাজার কোটি টাকা। যদিও খরচের মাত্রা আরও ছয় হাজার কোটি টাকা বেড়ে হয়েছিল ৪৩ হাজার কোটি টাকা। তাই স্বাভাবিকভাবেই গত ৮ বছরের মধ্যে এবারই এই প্রকল্পে কর্মদিবসের সংখ্যা গড়ে ছুঁয়ে ফেলল ৪৯। ইতিপূর্বে মনরেগা প্রকল্পে সর্বোচ্চ কর্মদিবস ছিল গড়ে ৪৬।

এই প্রকল্পে সেচ-ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও সরকার বড়ো সাফল্যের মুখ দেখেছে। জলাশয়, পুকুর, জলাধার, বাঁধ ইত্যাদির মতো প্রাকৃতিক উৎসগুলির ক্ষেত্রে সারা দেশে প্রায় ৪৬.৪৩ লক্ষ হেক্টর জায়গা জুড়ে সেচ-সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এতে উপকৃত হচ্ছেন ৩৩.৬১ লক্ষ মানুষ। জনজাতি ও খরা-প্রবণ এলাকাগুলির প্রতি সরকার আলাদা গুরুত্ব দিয়েছে। সরকারি পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, ২০১৫-১৬ অর্থবর্ষে তপশিলি জাতি ও উপজাতিদের ক্ষেত্রে মনরেগা প্রকল্পে মোট ব্যক্তি-দিনের নিরিখে যোগদানের হার যথাক্রমে ২২ শতাংশ ও ১৮ শতাংশ। রিপোর্টে আরও দেখা যাচ্ছে একশো দিনের কাজ পেয়েছে ৪৮.৫৪ লক্ষ পরিবার। এর মধ্যে খরা-প্রবণ এলাকাগুলিতে রয়েছে ২৮.৩৫ লক্ষ পরিবারের বাস।

গ্রামীণ অর্থনীতির এই বিকাশ স্বাভাবিকভাবেই দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক বৃদ্ধিরও যথেষ্ট সহায়ক হয়েছে। আর তাতেই গাত্রদাহ হয়েছে মুষ্টিমেয় বিরোধীদের। গোয়া, গুজরাট কিংবা হরিয়াণার মতো বিজেপি শাসিত রাজ্যে মনরেগা প্রকল্পে যোগদানের হার কম এই দাবিও নস্যাৎ করেছেন কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী বীরেন্দর সিং। রিপোর্টে এও দেখা যাচ্ছে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে মনরেগা প্রকল্পকে কাজে লাগিয়ে ব্যক্তিগত সম্পদ বৃদ্ধির উদাহরণ নেই। কিন্তু অন্যান্য রাজ্যে এই অভিযোগ উঠেছে। সুতরাং এই প্রকল্পে স্বচ্ছতার নিরিখে দলগতভাবেও বিজেপি অন্যান্যদের টেক্কা দিয়েছে বলে তথ্যাভিজ্ঞ মহলের অভিমত। একইসঙ্গে শ্রী সিং বলেছেন, তুলনামূলকভাবে বেশি লাভদায়ক কাজের সুযোগ পাওয়ায় অনেকেই এই প্রকল্পে আগ্রহী নন এমন নমুনাও মিলেছে। যাকে অর্থনীতিবিদরা গ্রামীণ অর্থনীতির সর্বাঙ্গীণ উন্নতি বলেই মনে করছেন। ▮

একনজরে

- **ইউপিএ আমলে মনরেগা প্রকল্পে ব্যক্তি-দিনের সংখ্যা যেখানে কমতে কমতে ২১২ কোটি থেকে ১৫৩ কোটিতে গিয়ে ঠেকেছিল, বর্তমানে তার রেকর্ড বৃদ্ধি— ব্যক্তি-দিনের সংখ্যা ২৩৫ কোটি ছুঁয়েছে।**
- **এই প্রকল্পের উপভোক্তাদের আধার-কার্ডের মাধ্যমে জব কার্ড তৈরি, ইলেকট্রনিক ফান্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের মাধ্যমে প্রকল্পের তহবিল নির্মাণ কর্মসূচিতে অভাবনীয় সাফল্য।**
- **প্রকল্পের খরচ গত অর্থবর্ষে এযাবৎকালের মধ্যে সর্বাধিক ৪৩ হাজার কোটি টাকা। বাজেটে ধার্য অঙ্কের চেয়ে ৬ হাজার কোটি টাকা বেশি।**
- **বিগত ৮ বছরের মধ্যে এবারই এই প্রকল্পে গড় কর্মদিবসের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি— ৪৯।**

বিদেশের জেল থেকে এগারোজন ভারতীয়ের মুক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি।।

নাইজিরিয়ার জেলে প্রায় দু'বছর বন্দি থাকার পর এগারোজন ভারতীয় মুক্তি পেলেন। সম্প্রতি তারা দেশে ফিরে এসেছেন। জানা গেছে, ঘুষ না দেওয়ার জন্য মিথ্যে মামলায় ফাঁসিয়ে তাদের এতদিন আটকে রাখা হয়েছিল। ২০১৩ সালের অক্টোবর মাসে ভারতের এগারো জন নাবিক একটি বাণিজ্যতরীতে সওয়ার হয়ে নাইজিরিয়ায় রওনা দেন। তাঁরা প্রত্যেকেই চাকরি করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু জাহাজটি ব্রাস বন্দরে লাগার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বেআইনি অনুপ্রবেশের অভিযোগে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। সম্প্রতি অন্য একটা সূত্রে খবর পেয়ে বিদেশমন্ত্রক তৎপরতা শুরু করে। বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজের ক্রমাগত চেষ্টা এবং নাইজিরিয়ায় নিযুক্ত ভারতীয় রাষ্ট্রদূত বি এন রেড্ডির সক্রিয়তায় সবাইকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়।

উবাচ

"কোন রাজ্যে কোন দলের শাসন সেসব বিচার না করে আমরা শুধু রাজ্যের উন্নয়নে জোর দিয়েছি, স্বাধীনতার পর যা এ দেশে কখনো হয়নি।"

নরেন্দ্র মোদী
ভারতের প্রধানমন্ত্রী

কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি উপলক্ষে।

"ঢাকায় হামলাকারী জঙ্গিরা সম্পন্ন পরিবারের এবং তাদের পড়াশুনাও নামিদামি স্কুলে হয়েছে। দয়া করে বলবেন না যে, দারিদ্র্য ও অশিক্ষাই মানুষকে জঙ্গি তৈরি করে।"

তসলিমা নাসরিন

ঢাকায় জঙ্গিহানা প্রসঙ্গে।

"আমাদের রাজ্যে সন্ত্রাসীদের প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে। আমাদের রাজ্য মোটেই সুরক্ষিত নয়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সন্ত্রাস দমনে কড়া পদক্ষেপ নিতে হবে।"

দিলীপ ঘোষ
রাজ্য বিজেপি সভাপতি

ঢাকায় জঙ্গিহানার পরিপ্রেক্ষিতে মন্তব্য।

"সন্ত্রাসবাদীদের আইনগত সাহায্য দেওয়া দেশদ্রোহিতামূলক কাজ। কেউ করলে তার বিরুদ্ধে ফৌজদারি ব্যবস্থা নেওয়া যায়।"

শ্রীকান্ত শর্মা
বিজেপি মুখপাত্র

আসাদুদ্দিন ওয়াইসির হায়দরাবাদে ধরা পড়া সন্ত্রাসবাদীদের সাহায্য করা প্রসঙ্গে

"অঙ্গদান জীবনের এক শ্রেষ্ঠ উপহার। একে সামাজিক আন্দোলনের রূপ দেওয়া প্রয়োজন।"

জেপি নাড্ডা
কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী

অঙ্গদান অঙ্গীকার বিষয়ক এক সভায় বক্তব্য প্রসঙ্গে।

হিন্দুদের 'বধ্যভূমি' বাংলাদেশ

সুধী বুদ্ধিজীবী সমীপেষু,

এই দেশে সংখ্যালঘুদের নিয়ে আপনারা যেভাবে চিন্তিত থাকেন তাতে আমি গর্বিত। ভারতে সেভাবে সংখ্যালঘু নির্যাতন নেই বললেই চলে। মাঝে মধ্যে কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটলে, এমনকী রাষ্ট্রবিরোধী স্লোগান তোলার জন্য দেশদ্রোহীদের বিরুদ্ধে কেউ কথা বললেও আপনারা গর্জে ওঠেন। এটা সত্যিই প্রশংসার কাজ। এটাই ভারতীয় আদর্শ। কিন্তু সেই আদর্শই বলছে শুধু দেশে নয়, অন্য দেশে সংখ্যালঘুরা আক্রান্ত হলেও গর্জে ওঠা উচিত। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে সেই সংখ্যালঘু মানুষটি হিন্দু হলেই যে আর তার উপরে নির্যাতনের প্রতিবাদ করা যায় না। তাহলে সাম্প্রদায়িক হতে হয়।

বাংলার বুদ্ধিজীবী আপনারা। বাংলাদেশ নিয়ে খুব চিন্তিত থাকেন। কিন্তু এটা কি মানবেন যে শুধু কয়েকটি উগ্র মৌলবাদী গোষ্ঠীই সেখানে হামলা চালাচ্ছে? তা নয়, বাংলাদেশের সমাজের একটা বড় অংশ মৌলবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে গেছে। বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ খৃষ্টান ঐক্য পরিষদ দীর্ঘদিন ধরেই সংখ্যালঘুদের অত্যাচার নির্যাতনসহ মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় তীব্র উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। সংখ্যালঘুদের এই সংগঠনটির নেতৃবৃন্দ সম্প্রতি যে তথ্য জানিয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে, এই বছরের মাত্র প্রথম তিন মাস অর্থাৎ জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত সময়ে সংখ্যালঘুদের ১০ জনকে হত্যা, ৩৬৬ জনকে আহত, ১০ জনকে অপহরণ এবং ৬৫৫টি ধর্মীয় স্থাপত্য ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়েছে বাংলাদেশে।

বাংলাদেশের বর্তমান সরকার নিশ্চয়ই চেষ্টা করছেন সংখ্যালঘুদের উপরে নির্যাতন বন্ধের, কিন্তু তাঁদের সেই প্রচেষ্টায় নিশ্চিন্ত নন সে দেশের সংখ্যালঘু বাসিন্দারা। সংখ্যালঘুদের মনে যে ভয় ঢুকে গেছে, সেটা দূর করতে হবে বাংলাদেশ সরকারকে। কারণ, বাংলাদেশের সমাজের একটা বড় অংশই মৌলবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে গেছে। সব বড় রাজনৈতিক দলগুলিই কোনো না কোনোভাবে সংখ্যালঘু নির্যাতনের সঙ্গে জড়িয়ে। হত্যাগুলো হয়তো কয়েকটি উগ্র মৌলবাদী গোষ্ঠীই করছে। কিন্তু সমর্থন পাচ্ছে রাজনৈতিক দলগুলির।

তাই বাংলাদেশ থেকে ভারতে আসা চলছেই। দেশভাগের ৭০ বছর পেরিয়ে গেলেও ছবিটা সেই একইরকম। অস্থির বাংলাদেশের মাটি ছেড়ে আবার পালাচ্ছেন হিন্দুরা। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ অস্থিরতা ও সংখ্যালঘুদের উপরে ক্রমাগত আক্রমণে ভীতসন্ত্রস্ত মানুষ সবকিছু ফেলে পাড়ি জমাচ্ছেন ভারতে।

বাংলাদেশে সম্প্রতি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর বেশ কয়েকটি হামলার ঘটনা ঘটেছে। এসব হামলায় মঠ, মন্দির ও উপাসনালয়ের সেবায়েত, পুরোহিতকে খুন করা হয়েছে। এসব ঘটনার প্রেক্ষিতে টাইমস অব ইন্ডিয়ার এক প্রতিবেদনে আশঙ্কা করা হয়েছে যে, বাংলাদেশ থেকে অভিবাসনের ভয়ে আছে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক।

আরতি টিক্কো সিংয়ের ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক ছিল শতকরা ১৪ শতাংশ। এখন সেই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে আট-এর নিচে। সংখ্যালঘুদের ওপর আক্রমণ চালিয়ে বাংলাদেশে আলকায়েদার ঘাঁটি স্থাপন করাই লক্ষ্য।

বাংলাদেশে গত বছর থেকে ধর্মীয় সংখ্যালঘু, নাস্তিক ব্লগার, ধর্মনিরপেক্ষ কর্মী এবং বুদ্ধিজীবীদের ওপর সহিংস আক্রমণ শুরু হয়। এসব ঘটনায় মধ্যপ্রাচ্য ভিত্তিক জঙ্গি সংগঠন আই এস কয়েকটির দায় স্বীকার করেছে। আই এস আসছে বলে ফিসফিসানি শুরু হয়েছে। এ অবস্থায় হিন্দুদের ভারতে আসার পরিকল্পনা আরও বাড়বে বলেও প্রতিবেদনে মন্তব্য করা হয়েছে।

শেখ হাসিনার সরকার দেশে আলকায়েদা বা আই এসের অস্তিত্বের কথা অস্বীকার করেছে এবং সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন ও সহিংসতার জন্য অনবরত বিএনপি ও জামায়েতে ইসলামিকে দায়ী করছে। কিন্তু সরকারকে এ ব্যাপারে দায়িত্ব নিতে হবে। শুধু দোষারোপ করলে চলবে না।

আপনারা কী বলেন? এ রাজ্যের অতি-সংখ্যালঘু-দরদি বুদ্ধিজীবীরা?

— **সুন্দর মৌলিক**

জেহাদি সন্ত্রাস এখন কলকাতার দোরগোড়ায়

ইস্তানবুল, কাবুল, ঢাকা এই তিন শহরের মিলটা কোথায়? প্রশ্নের উত্তর সকলেরই জানা আছে। এই তিন শহরই মুসলমান শাসিত এবং বর্তমানে আত্মঘাতী জেহাদি মুসলমানদের হাতে আক্রান্ত। এই জেহাদিরা 'ইসলম বিপন্ন' এমন জিগির তুলে নির্বিচারে মানুষকে হত্যা করে। ধর্মপ্রাণ মুসলমানও এইসব আত্মঘাতী জেহাদি জঙ্গিদের হাতে মারা পড়ে। তাই ধর্মরক্ষার প্রয়োজনে জেহাদের ডাক দেওয়া হয়— এমন ধারণা মিথ্যা। কিছু স্বার্থান্বেষী মুসলমান নেতার স্বার্থরক্ষার জন্যই জেহাদের ডাক দেওয়া হয়। অর্ধশিক্ষিত, দরিদ্র, সরলমতি মুসলমান যুবকদের মগজধোলাই করে ধর্মের নামে তাদের মরতে পাঠায় ইসলামের তথাকথিত ধ্বজাধারীরা। সম্প্রতি প্যারিস, ইস্তানবুল, কাবুল এবং ঢাকায় জঙ্গিরা যে হামলা চালিয়েছে তার সঙ্গে ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই। জেহাদ এখন আর ধর্মযুদ্ধ নয়। নিছকই ব্যক্তিস্বার্থরক্ষার লড়াই।

গত সপ্তাহে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার গুলশনে জনপ্রিয় অভিজাত স্প্যানিশ রেস্তোরাঁর আর্টিজান বেকারিতে যে হামলা হয়েছে তার সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক নেই। ইসলামের নামে রক্তপিপাসু কিছু পেশাদার খুনি হত্যা ও সন্ত্রাস সৃষ্টি করে হিন্দু খৃষ্টানদের বাংলাদেশ থেকে তাড়াতে চাইছে। আর তা করতে গিয়ে তারা মুসলমানদেরও হত্যা করছে। ইস্তানবুল, কাবুল এবং ঢাকায় যে আত্মঘাতী জঙ্গি হামলা হয়েছে তাতে অনেক সাচ্চা মুসলমানও মারা গেছে। সুতরাং 'ইসলাম বিপন্ন' এমন জিগির মানা যাচ্ছে না। গুলশানে নিহত ইশরত আখন্দ ও ফারাজ হোসেনরা কি সাচ্চা মুসলমান ছিলেন না?

ঢাকা থেকে কলকাতার আকাশপথে দূরত্ব মাত্র আধ ঘণ্টা সময়ের। আত্মঘাতী জেহাদি সন্ত্রাস তাহলে এবার কলকাতার দোরগোড়ায়। মুম্বই, দিল্লী, হায়দরাবাদ, কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদী হামলা বাঙালিদের কাছে অজানা নয়। তবু আমরা এতকাল মনে করেছি পশ্চিমবাংলা নিরাপদ। কেন এমন আজগুবি চিন্তাকে বাঙালি প্রশ্রয় দিয়েছে তার জবাব আমার জানা নেই। সম্ভবত বাঙালির স্বভাবটা মরুভূমির উটপাখির

গুরুপুরুষের কলম

মতো। বালিতে মুখ গুঁজে থেকে উটপাখি মনে করে সে নিরাপদে আছে। যেমন, বিপদ সরাসরি ঘাড়ে এসে না পড়া পর্যন্ত বাঙালি মনে করে সে নিরাপদে আছে। বাংলাদেশের বাঙালি মুসলমানও এমনটাই মনে করেছে। গত দেড় বছর ধরেই বাংলাদেশে একের পর এক মৌলবাদী হামলার শিকার হয়েছে বিদেশি ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ। গত আট মাসে বাংলাদেশের রংপুর, সাতক্ষীরা-সহ ১৯টি জায়গায় সন্ত্রাসবাদী হামলা হয়েছে। তবু সেখানের বাঙালি মুসলমান মনে করেছে তারা নিরাপদ। অথচ তাঁরা জানেন যে কট্টর ইসলামি মৌলবাদীদের চোখে বাঙালি মুসলমান এবং বাঙালি হিন্দু দুই সম্প্রদায়ের মানুষই কাফের।

বাংলাদেশের গোয়েন্দা রিপোর্টে একাধিকবার শেখ হাসিনার সরকারকে সতর্ক করা হয়েছিল যে ঢাকায় বড়সড় জেহাদি আক্রমণের ছক কষা হয়েছে। কিন্তু হাসিনা সরকার প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা নেয়নি। উল্টে প্রচার করেছে যে বাংলাদেশের মাটিতে আই এস বা আলকায়েদার মতো সংগঠনের অস্তিত্বই নেই। এমনকী, ঝিনাইদহতে হিন্দু পুরোহিতকে হত্যা করার দায় শেখ হাসিনার সরকার জামাত এবং বি এন পি-র ঘাড়ে চাপিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে চেয়েছে। হাসিনার আওয়ামি লিগ সরকারের অজানা নয় যে বাংলাদেশে ছোট বড় অনেকগুলি জঙ্গি সংগঠন সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। হিন্দু হত্যার কাজে লিপ্ত আছে আনসারুল্লা বাংলা, জামাতুল মুজাহিদিন, জামাত-ই-ইসলাম। এই সব বিচ্ছিন্ন মৌলবাদী জঙ্গি সংগঠনগুলিকে এক ছাতার তলায় আনতে বাংলাদেশে বিশেষভাবে সক্রিয় আছে আই এস বা ইসলামিক স্টেট। হাসিনার আওয়ামি লিগ সরকারের বোঝা উচিত যে বাংলাদেশের মাটিতে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তারে সক্রিয় হয়েছে আই এস। তাদের উদ্দেশ্য, সারা দুনিয়ায় কট্টর মৌলবাদী ইসলামের শাসন প্রতিষ্ঠা করা। বিভিন্ন দেশের জঙ্গি সংগঠনগুলিকে তাদের প্রভাবে এনে ধারবাহিক হামলা চালানো। ভারতে ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন এখন আই এসের নেতৃত্বে কাজ করে। আফগানিস্তানে তালিবানদের হঠিয়ে দিয়েছে আই এস। একইভাবে ইয়েমেন, লেবানল, জর্ডন, আলজেরিয়া, লিবিয়া, পশ্চিম আফ্রিকার বোকো হারাম প্রভাবিত এলাকা, এশিয়ার ফিলিপিন্স, প্যালেস্তাইন আই এসের নিয়ন্ত্রণে চলে গিয়েছে। তুরস্ক, কাতার, সিরিয়া ও সৌদি আরব আই এসকে অর্থ ও অস্ত্র সাহায্য করে চলেছে। এদের মধ্যে কাতার ও সৌদি আরব ভারতে আই এসকে প্রভাব বাড়াতে বিশেষভাবে সাহায্য করছে। ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন এবং জামাতের হাত ধরে বাংলাদেশের প্রতিবেশী দুই রাজ্য অসম ও পশ্চিমবঙ্গে আই এস জঙ্গিরা যে নাশকতার ছক কষছে না এমন কথা কি অস্বীকার করা যায়? আমাদের বুঝতে হবে যে বাংলাদেশ থেকে অবাধ অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে না পারলে এই দুই রাজ্যের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। অনুপ্রবেশ এবং জেহাদ একই মুদ্রার দুই পিঠ। ▮

ক্রমবর্ধমান অনুৎপাদক সম্পদ জাতীয় অর্থনীতির নিঃশব্দ ঘাতক

অম্লানকুসুম ঘোষ

কখনও কখনও কোনো মানুষকে বাইরে থেকে দেখে খুব সুস্বাস্থ্যের অধিকারী বলে মনে হয়, কিন্তু ভেতর ভেতর সেই মানুষটিই আক্রান্ত থাকেন কোনো মারণ ব্যাধিতে। একথা অপ্রিয় হলেও সত্য যে বর্তমান ভারতীয় অর্থনীতি এরকমই এক ব্যাধির কবলগ্রস্ত এবং এই ব্যাধির সংক্রমণ হয়েছে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক দেহকাঠামোর রক্তসংবহনতন্ত্র- রূপে ব্যাঙ্কিং-ব্যবস্থায়।

কোনো জীবদেহের মধ্যে প্রাণের সার্থক বিকাশসাধনের জন্য যেমন সেই দেহকাঠামোর সর্বাঙ্গে প্রাণরস প্রয়োজন, তেমনই অর্থনীতির বিকাশসাধনের জন্য সেই রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যে অর্থের সামগ্রিক সঞ্চালন প্রয়োজন। অর্থ হলো বিনিময়ের মাধ্যম বা ক্রয়ক্ষমতার মাপকাঠি অর্থাৎ প্রাণীদেহের অন্তর্গত অসংখ্য কোষসমূহের ন্যায়। রাষ্ট্রকাঠামোর অন্তর্গত অসংখ্য মানুষের প্রত্যেকে তার কর্মের ফল হিসেবে যে ক্রয়ক্ষমতার অধিকারী হয় তা অর্থের মাধ্যমে লাভ করে। এই লভ্য অর্থ বা অর্জিত ক্রয়ক্ষমতা দু'ভাবে ব্যয়িত হতে পারে। এক, ভোগ্যবস্তু ক্রয়ের মাধ্যমে। দুই, বিনিয়োগের মাধ্যমে। এই দুই পদ্ধতিতে ব্যয়ের পরেও কোনো ব্যক্তি উদ্বৃত্ত অর্থ বা ক্রয়ক্ষমতার অধিকারী থাকতে পারে আবার কোনো ব্যক্তির প্রাপ্য অর্থের অতিরিক্ত অর্থের দরকার হতে পারে উপরোক্ত দুই পদ্ধতিতে ব্যয়ের কারণে। এরকম ক্ষেত্রে এই দুই ব্যক্তি অর্থাৎ রাষ্ট্রদেহের দুই পৃথক জীবকোষ পরস্পরের পরিপূরক হয়ে যায় এবং এদের পরস্পর বিপরীতমুখী প্রয়োজনকে পরস্পরের প্রয়োজন নিবারক হতে সাহায্য করে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থা একদিকে উদ্বৃত্ত অর্থ বা ক্রয়ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তিকে দেয় সঞ্চয়ের সুযোগ ভবিষ্যতের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে, অন্যদিকে অধিক অর্থ বা ক্রয়ক্ষমতা আকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিকে তার প্রয়োজনীয় অর্থ বা ক্রয়ক্ষমতা প্রদান করে ভবিষ্যতে নিজের অর্জিত অর্থ বা ক্রয়ক্ষমতা থেকে তা পরিশোধ করার চুক্তির বিনিময়ে। এভাবেই উদ্বৃত্ত অর্থের জোগান ও প্রয়োজনীয় অর্থের চাহিদার মধ্যে সমন্বয় সাধন করে অর্থনীতির অগ্রগতির পথ প্রশস্ত করে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা। ধরা যাক কোনো একজন ব্যক্তি রামবাবু তার কাজের জন্য মাসে ১০ হাজার টাকা পান অর্থাৎ মাসে দশ হাজার টাকার সমমানের বস্তু ক্রয় করার অধিকার লাভ করেন, কিন্তু প্রয়োজনীয় যাবতীয় দ্রব্যাদি কিনতে তার মাসে আট হাজার টাকা লাগে, বাকি দু' হাজার টাকা তিনি সঞ্চয় করেন ভবিষ্যতের জন্য। আবার শ্যামবাবু তারও আয়-ব্যয় রামবাবুর মতোই কিন্তু তার মনে এক বিশেষ পরিকল্পনা আছে, যে পরিকল্পনা ভবিষ্যতে অধিক উপার্জনের দরজা খুলে দেবে অর্থাৎ অর্থনৈতিক বৃদ্ধি ঘটাতে সাহায্য করবে। কিন্তু তার জন্য প্রয়োজনীয় বস্তু ও শ্রম ক্রয় করতে বর্তমানে পাঁচ লক্ষ টাকা প্রয়োজন যা তাঁর কাছে নেই, এখানেই ব্যাঙ্কিং-ব্যবস্থার ভূমিকা। সে রামবাবু এবং তাঁর মতো আরও আড়াইশো লোকের সঞ্চয় একত্রিত করে শ্যামবাবুকে দেয় বিনিয়োগ করার জন্য। এর ফলে রামবাবু পান তার সঞ্চয়ের অধিক মূল্য ও নিরাপত্তা এবং শ্যামবাবু পান তাঁর পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করার রসদ এবং সামগ্রিক অর্থনীতি পায় বৃদ্ধির পথে চলার শক্তি। সেজন্য পৃথিবীর সমস্ত প্রান্তে বিভিন্ন সময়ে গড়ে ওঠা মানবসভ্যতাতেই ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার অস্তিত্ব দেখা যায়। আর যদি কোনো দেশে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় বিপর্যয় দেখা দেয় তাহলে সেই দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিই বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। যেমন দেখা গেছিল ২০০৮ খৃষ্টাব্দে আমেরিকায়। আর যে দেশে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার অস্তিত্বই নেই সে দেশে প্রত্যেক মানুষ থাকে এককোষী প্রাণীর মতো পৃথক। সেখানে একের সঞ্চয় অপরের বিনিয়োগে পরিবর্তিত হয় না, প্রত্যেকে তার সীমিত উদ্বৃত্তের মধ্যেই নিজের প্রয়োজনীয় ভোগব্যয় ও বিনিয়োগ করতে বাধ্য হয়। ফলে বিনিয়োগের অনেক উন্নত পরিকল্পনা

কোম্পানি দেউলিয়া হচ্ছে (ব্যাঙ্কঋণ শোধ-এ ব্যর্থ হয়ে) অথচ ব্যাঙ্ক কোম্পানির মালিকের সম্পত্তি ক্রোক করতে পারছে না। এক্ষেত্রে কোম্পানি সংক্রান্ত আইনের পরিবর্তন ঘটিয়ে কোম্পানির মালিককে কোম্পানির লাভের সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানির দায়েরও অংশীদার করলে স্বেচ্ছাকৃত ঋণখেলাপি এই কৌশলী চোরেদের দমন করা যাবে।

ব্যর্থ হয় প্রয়োজনীয় উদ্বৃত্তের অভাবে। আবার অধিক উদ্বৃত্তের অধিকারী সঞ্চয়ের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয় বিনিয়োগের উপযুক্ত ও নিজস্ব পরিকল্পনার অভাবে। অর্থনীতির এহেন বিপর্যয়ের সাক্ষী ছিল তালিবানশাসিত আফগানিস্থান (ইসলামে সুদের কারবার নিষিদ্ধ বলে সেই সময় আফগানিস্থানে ব্যাঙ্ক ছিল বেআইনি)।

সৌভাগ্যবশত, ভারতের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা উন্নতমানের। ২০০৮ খৃষ্টাব্দে গোটা বিশ্ব যখন অর্থনৈতিক মন্দার সম্মুখীন হয়েছিল তখন শুধুমাত্র উন্নতমানের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার দৌলতে ভারত সেই বিশ্বব্যাপী মন্দার হাত থেকে তো রক্ষা পেয়েছিলই, উপরন্তু নিজের জিডিপি বৃদ্ধির হার ধরে রেখেছিল ৮ শতাংশের চেয়ে বেশিতে। পরবর্তীকালে জনধনযোজনা প্রভৃতি জনহিতকর নানা পদক্ষেপে বর্তমানে দেশের প্রতিটি মানুষ ব্যাঙ্কিং-পরিষেবার সুবিধাপ্রাপ্ত, কিন্তু ভারতীয় অর্থনীতির গর্ব সেই ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থাই বর্তমানে ধ্বংসের সম্মুখীন। ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা দু'রকমভাবে ধ্বংস হতে পারে। প্রথমত, ব্যাঙ্কের পরিচালন কর্তৃপক্ষ নিজেরাই স্বার্থচালিত হয়ে সঞ্চয়কারীদের অর্থ আত্মসাৎ করলে (যেভাবে স্বাধীনতার আগে ও অব্যবহিত পরে বহু বেসরকারি ব্যাঙ্ক লালবাতি জ্বেলেছিল)। দ্বিতীয়ত, ব্যাঙ্কের থেকে ঋণ নিয়ে ঋণগ্রহীতারা তা শোধ না করলে (অর্থাৎ শ্যামবাবু টাকা ফেরত না দিলে)। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও কেন্দ্রীয় আইনসভার নির্দিষ্ট নিয়মবিধি ও নিয়মিত নজরদারির জন্য প্রথমোক্ত বিপদ থেকে দেশ এখন মুক্ত কিন্তু দ্বিতীয় বিপদ তার অনাগত পদধ্বনি শুনিয়ে দিয়েছে ইতিমধ্যেই। গত পাঁচবছর ধরেই অর্থাৎ ২০১১ সাল থেকেই ভারতীয় ব্যাঙ্কসমূহের (বিশেষ করে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কসমূহের) অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ ক্রমবর্ধমান। এবছর সেই পরিমাণ হয়ে দাঁড়িয়েছে পর্বতপ্রমাণ। সদ্যসমাপ্ত ২০১৫-১৬ আর্থিক বছরে ভারতীয় রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কসমূহের মোট অনুৎপাদক সম্পদ (অনাদায়ী ঋণের পারিভাষিক নাম) দাঁড়িয়েছে ৪ লক্ষ কোটি টাকা। এই বিপুল পরিমাণ অর্থে পশ্চিমবঙ্গের মতো চারটি রাজ্যের বার্ষিক বাজেট সম্পন্ন হয়। যদিও এই অর্থ ব্যাঙ্কগুলির মোট দেওয়া ঋণের মাত্র ৫.৬৫ শতাংশ (অর্থাৎ মাত্র ৫.৬৫ শতাংশ লোক চুক্তির খেলাপ করেছে)। কিন্তু এর জেরেই দেশের সবকটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কেরই লাভের পরিমাণ কমেছে, বেশ কিছু ব্যাঙ্ক তো ক্ষতির খাতায় নাম তুলেছে এবং এর বিপদ শুধু ব্যাঙ্কিং-শিল্পেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, অর্থনীতির সবকটি ক্ষেত্রকেই করবে ব্যহত। লভ্যাংশের হ্রাস ঘটিয়ে বা ক্ষতির খাতায় নাম তুলে সাময়িকভাবে এই সমস্যাকে ঠেকিয়ে রাখা যায় কিন্তু অনুৎপাদক সম্পদের এই বৃদ্ধি ক্রমাগত চলতে থাকলে অর্থাৎ শ্যামবাবুরা নিয়মিতভাবে টাকা শোধ না দিতে থাকলে ব্যাঙ্কিংয়ের চাহিদা জোগানের স্বাভাবিক নিয়মে কিছুদিন বাদেই আমানতকারীদের (অর্থাৎ রামবাবুদের) সঞ্চিত টাকা ফেরত দিতে কিয়দংশে ব্যর্থ হবে ব্যাঙ্ক। কিয়দংশে ব্যর্থ হলেই সকল আমানতকারীর মনে দেখা দেবে আশঙ্কা। একসঙ্গে সকলে টাকা তুলে নিতে চাইবে, মেয়াদি ঋণে গচ্ছিত অর্থ ব্যস্ত থাকায় সেই টাকা ফেরত দিতেও ব্যর্থ হবে ব্যাঙ্ক। অর্থনৈতিক সেই তীব্র অবিশ্বাসের পরিবেশে নতুন গ্রাহকরাও সঞ্চয়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যাঙ্ককে বেছে নেবে না, মৃত্যু হবে সমস্ত ব্যাঙ্কিং-ব্যবস্থার। টাকা ফেরত না দেওয়া অসৎ শ্যামবাবুরা হবেন বিরাট ধনী আর বিনিয়োগকারী পরিকল্পনাকারী সৎ ভবিষ্যতের অসংখ্য শ্যামবাবু হবেন ঋণবঞ্চিত। সঞ্চিত অর্থ ফেরত না পেয়ে এযুগের কিছু রামবাবু হবেন সর্বস্বান্ত আর ভবিষ্যতের সমস্ত রামবাবু হবেন সঞ্চয়ের সুবিধাবঞ্চিত। অর্থাৎ সামান্য কিছু অসাধু লোকের জন্য প্রত্যক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হবেন প্রচুর মানুষ আর পরোক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে সমগ্র দেশ। স্বাধীনতার আগে গিরীশ ঘোষের প্রফুল্ল নাটকে ও স্বাধীনতার পরে সত্যজিৎ রায়ের মহানগর ছবিতে এই ক্ষতির মর্মান্তিক পরিণাম আমরা দেখেছি (যদিও দুটি ক্ষেত্রেই ব্যাঙ্কফেল ঘটেছিল প্রথম কারণে কিন্তু ব্যাঙ্কফেলের কারণ যাই হোক ফলাফল সর্বত্রই এক)। তার পরের ফলাফল আরও ভয়াবহ। প্রকৃতিতে কোনো স্থান শূন্য থাকে না। ভারতীয় রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কসমূহের ছেড়ে যাওয়া সেই স্থান দখল করবে দেশীয় মহাজনশ্রেণী ও এখনও পর্যন্ত ভারতীয় রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কসমূহের প্রতিযোগিতায় সংযত বিদেশি ব্যাঙ্কগুলি। তাদের একচেটিয়া শোষণে রিক্ত হবে ভারতীয় সমাজ। অর্থাৎ হয় ব্যাঙ্কবিহীন আদিম অর্থনীতি নয়তো শোষক ব্যাঙ্কসমূহের হাতে বন্দি অর্থনীতি— এই হবে আমাদের ভবিষ্যৎ।

সমস্যা তো হিমালয়সদৃশ, কিন্তু সমাধান কোথায়? সমাধান আছে আইনসভার হাতে। দু'ধরনের আইন সংশোধনের মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব। কোম্পানি সংক্রান্ত আইনে কোম্পানির মালিক আর কোম্পানি আলাদা অস্তিত্ব হওয়ার সুযোগে বেশ কিছু কোম্পানির অসাধু মালিক হিসেবের কারচুপি করে ঘুরপথে কোম্পানির টাকা নিজের নামে সরিয়ে কোম্পানির ক্ষতি দেখিয়ে নিজেরা ধনী হচ্ছে। কোম্পানি দেউলিয়া হচ্ছে (ব্যাঙ্কঋণ শোধ-এ ব্যর্থ হয়ে) অথচ ব্যাঙ্ক কোম্পানির মালিকের সম্পত্তি ক্রোক করতে পারছে না। এক্ষেত্রে কোম্পানি সংক্রান্ত আইনের পরিবর্তন ঘটিয়ে কোম্পানির মালিককে কোম্পানির লাভের সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানির দায়েরও অংশীদার করলে স্বেচ্ছাকৃত ঋণখেলাপি এই কৌশলী চোরেদের দমন করা যাবে। দ্বিতীয়ত, স্বেচ্ছাকৃত ঋণখেলাপিদের ফৌজদারি ব্যবস্থার আওতায় আনা উচিত। তাতে অনাদায়ী ঋণ আদায়ে সুবিধা হবে। তবেই উদ্ধার পাওয়া যাবে এই বিশাল সমস্যার হাত থেকে। সরকারের প্রথম দু' বছরে নানাবিধ অর্থনৈতিক সংস্কার সাধন করে জাতীয় অর্থনীতির প্রচুর কল্যাণ সাধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাঁর কাছে আশা, এক্ষেত্রে এই সংস্কার দুটি সাধনের মাধ্যমে বর্তমানের উল্লম্ফনরত ভারতীয় অর্থনীতিকে তিনি মৃতসঞ্জীবনী প্রদান করবেন। আর তা না হলে বিজয় মাল্যর মতো ছদ্মবেশী চোরেরা রাজকীয় জীবনযাপন করবে আর দরিদ্র চাষি ফসলের বীজ কেনার টাকার অভাবে আত্মহত্যা করবে। এখন দেখা যাক কী আমাদের ভবিষ্যৎ। ■

বিজ্ঞানের স্পর্শে ইতিহাসের শাপমুক্তি

সরস্বতীর তীরে হরপ্পার আদি পর্বের সন্ধান

সন্দীপ চক্রবর্তী

পৃথিবীর সব থেকে প্রাচীন সভ্যতা কোন্‌টি? এযাবৎ উত্তরটা ছিল মিশর অথবা মেসোপটেমিয়া। কিন্তু এখন থেকে উত্তরটা হবে সিন্ধু- সরস্বতী সভ্যতা। বিজ্ঞানী এবং প্রত্নতাত্ত্বিকদের সেরকমই অভিমত।

সাধারণত ধ্বংসস্তূপ কোনো কথা বলে না। সময় আজ যা নির্মাণ করে কাল তা নিজেই মুছে দেয়। কিন্তু মানুষ বুদ্ধিমান বিচক্ষণ প্রাণী। সে সময়ের সেই মুছে দেওয়া অদৃশ্য সঙ্কেত পাঠ করতে পারে। ঠিক যেমন ভারতীয় বিজ্ঞানীরা করলেন। আই আই টি খড়্গপুর, আর্কিওলজিকাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া এবং ডেকান কলেজ পুনের বিশেষজ্ঞরা বেশ কিছুদিন ধরেই হরপ্পা সভ্যতার উৎসের সন্ধান করছিলেন। হরিয়াণা, পাঞ্জাব, রাজস্থান, গুজরাট এবং তামিলনাড়ুর ৫০০টি স্থানে উৎখনন চালিয়ে তাঁরা যা আবিষ্কার করেছেন তাতে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা সম্বন্ধে ধারণাই পালটে যাবে। সিন্ধু নদের অববাহিকা (অধুনা পাকিস্তানে) থেকে যাত্রা শুরু করে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত ধরে এগিয়ে দক্ষিণ এবং পূর্বে ছড়িয়ে পড়া এই সভ্যতা ইতিমধ্যেই নৃতত্ত্ব এবং প্রত্নতত্ত্বের গবেষকদের বিস্মিত করে তুলেছে। তার কারণ, এতকাল আমরা জানতাম হরপ্পা সভ্যতা (বা সিন্ধু-সরস্বতী সভ্যতা) ৫০০০ বছরের সভ্যতা। মিশরিয় বা মেসোপটেমিয় সভ্যতার তুলনায় অপেক্ষাকৃত নবীন। কিন্তু হরিয়াণার ভিরানা ও খড়িবাড়ি অঞ্চলে আবহাওয়ার পরিবর্তনজনিত তথ্যাদি বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা জানতে পেরেছেন হাকরা-ঘর্ঘরা নদীর উপত্যকায় সম্ভবত হরপ্পা সভ্যতার থেকেও প্রাচীন একটি সভ্যতা গড়ে উঠেছিল যার বয়স আট থেকে ন' হাজার বছর। সেই সঙ্গে আরও একটি ব্যাপারে আলোকপাত করেছেন বিজ্ঞানীরা। এতকাল এদেশের বৃটিশ এবং পূর্ব-ইউরোপীয় ধ্যানধারণায় চালিত ঐতিহাসিকদের কাছে সরস্বতী নদী ছিল 'অ-ঐতিহাসিক', 'ভিত্তিহীন', 'মুনিঋষিদের কল্পনা'। সাম্প্রতিক আবিষ্কারে সেই সরস্বতী নদী বৈজ্ঞানিক সিলমোহর লাভ করে ধন্য হয়েছে। বিজ্ঞানীরা মেনে নিয়েছেন সরস্বতী নদী ছিল। জটিল ভূতাত্ত্বিক কারণে যা হারিয়ে যায়। গত একশো বছরে ৫০০টি এমন স্থান আবিষ্কৃত হয়েছে যা হরপ্পা সভ্যতার সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। এর মধ্যে কালিবঙ্গান, কুনাল, ভিরানা ফারমানা গিরাওয়ার্ড ইত্যাদি স্থানে যা তথ্য মিলেছে তাতে পরিষ্কার হরপ্পা সভ্যতার আদিপর্ব এখানেই সংঘটিত হয়েছিল। বিজ্ঞানীদের অভিমত (নাসার উপগ্রহ চিত্রও যা সমর্থন করে) লুপ্ত সরস্বতী নদী প্রাচীনকালে এই অঞ্চল দিয়েই প্রবাহিত হোত। বস্তুত এই সভ্যতাকে সরস্বতী নদী অবহাহিকার সভ্যতা বললে বিন্দুমাত্র অতিশয়োক্তি হবে না। পরবর্তীকালে যা ভারতের জাতিসত্তা নির্মাণে প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, তামিলনাড়ুর শিবগঙ্গা অঞ্চলেও বিজ্ঞানীরা উৎখনন চালিয়েছিলেন

রাখীবাড়িতে খননকার্যে প্রাপ্ত মানবদেহের জীবাশ্ম।

হরপ্পাসভ্যতার আদিপর্বের সন্ধানে। ভারত নামক ভূখণ্ডের মানুষ যে সে যুগ থেকেই একটি বৈচিত্র্যময় এবং আপাতদৃষ্টিতে পরস্পরবিরোধী কিন্তু এক অমোঘ যোগসূত্রে বাঁধা সংস্কৃতির অঙ্গ, প্রমাণ মিলেছে তার। আমরা যদি অত্যাধুনিক কার্বন ডেটিং পরীক্ষা এবং অন্যান্য প্রযুক্তিনির্ভর পর্যবেক্ষণের ফলাফল বিশ্বাস করি তাহলে মানতেই হবে এই আবিষ্কার আমাদের প্রাচীন ভারত সম্পর্কিত ধারণা এবং সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক তত্ত্বগুলিকে সম্পূর্ণ নস্যাৎ করতে চলেছে। বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন এই সভ্যতার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল মানিয়ে চলার ক্ষমতা। নগরসভ্যতা যত সম্প্রসারিত হয়েছে, তারা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় গেছেন। মানিয়ে নিয়েছেন প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে। ভিরানাতে পাওয়া গেছে আদিমতম নগর সভ্যতার চিহ্ন। পরে যা উৎকর্ষের শিখরে পৌঁছেছে। ইন্ডিয়ান আর্কিওলজিকাল অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক কে এন দীক্ষিত এ প্রসঙ্গে বলেছেন, 'কার্বন ডেটিং পরীক্ষার পর আমরা নিশ্চিত নগরায়ন শুরু হয়েছিল সরস্বতী অববাহিকায় ভিরানা অঞ্চলে। সময়টা খৃষ্টপূর্ব অষ্টম সহস্রাব্দ। অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব ৭৫০০ থেকে ৮২০০-র কোনো এক সময়ে। জীবাশ্মের বয়স পরিমাপের ক্ষেত্রে কার্বন ডেটিং সর্বজনস্বীকৃত পদ্ধতি।' সুতরাং এতদিন ধরে প্রচলিত বৃটিশ এবং বামপন্থী ঐতিহাসিকদের গল্পগুলোর ভিত যে নড়ে গেছে তাতে সন্দেহ নেই।

পুনের ডেকান কলেজের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপিকা আরতি দেশপাণ্ডে মুখোপাধ্যায় সাম্প্রতিক অভিযানগুলির ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটটি ব্যাখ্যা করলেন। হরপ্পা সভ্যতার উত্থানপর্ব শুরু হয়েছিল উত্তর-নব্য প্রস্তর যুগ বা ব্রোঞ্জ যুগে। যা আজ থেকে ৫৭০০ থেকে ৩৩০০ বছর আগে পাকিস্তানের সিন্ধু নদের উপত্যকা অঞ্চল থেকে ক্রমশ ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তবর্তী বিস্তীর্ণ সমতলভূমিতে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই পর্বের প্রধান কেন্দ্র হরপ্পা মহেঞ্জোদাড়ো (এখন পাকিস্তানে) এবং ভারতের লোথাল কলিবঙ্গান ধোলাভিরা হলেও এর সূত্রপাত আরও আগে। যা এতকাল ইতিহাসে 'মিসিং লিঙ্ক' হিসেবে বিখ্যাত ছিল। সাম্প্রতিক আবিষ্কার সেই হারানো যোগসূত্রের অনেকটাই উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে। এতদিন যতটা মনে করা হোত তার থেকেও বড়ো ছিল এই সভ্যতা। সম্ভবত ভারতের পূর্ব প্রান্তেও ছড়িয়ে পড়েছিল। যদিও এর ধ্বংসের কারণ এখনও স্পষ্ট নয়।

বিশ্বের সব থেকে প্রাচীন এবং সুমহান এই নগরসভ্যতা শুরুতে ছিল গ্রামীণ। ধীরে ধীরে তা হয়ে ওঠে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, আরাম-বিলাস, সম্পদ-বৈভবে ভরপুর নগরসভ্যতা। যার কেন্দ্রে ছিল বেশ কয়েকটি সুসংগঠিত শহর। সেখানকার ধাতুশিল্প মৃৎশিল্পের জৌলুস ছিল চোখ ধাঁধানো। প্রত্যেকটি শহরে ছিল ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালী। রাস্তার মোড়ে মোড়ে ছিল সাধারণ স্নানাগার। প্রত্যেক বাড়িতে ছিল শৌচাগার। পানীয় জলের ব্যবস্থা হোত কুয়োর মাধ্যমে। আরব-মেসোপটেমিয়ার সঙ্গে চলত বাণিজ্য। কিন্তু দিন কখনও সমান যায় না। সভ্যতার শেষপাদে নগরায়ন প্রক্রিয়া বন্ধ করে দিতে বাধ্য হলো পৌরসভাগুলো। বন্ধ করে দেওয়া হলো অনেক নাগরিক সুবিধা। হঠাৎ জনসংখ্যা কমে যাওয়ারও প্রমাণ পাওয়া গেছে। এ ব্যাপারে প্রত্নতত্ত্ববিদদের বিশ্বাস খৃষ্টপূর্ব ৫০০০ থেকে ৪২০০ অব্দের মধ্যবর্তী কোনো এক সময়ে গ্রীষ্মকালীন বৃষ্টিপাতে উল্লেখযোগ্য হ্রাস এবং সমগ্র এশিয়া জুড়ে ভয়ঙ্কর খরাই সম্ভবত এর জন্য দায়ী। যদিও এই মতের সমান্তরাল অন্য মতও রয়েছে। বিজ্ঞানীরা এখন প্রতিটি সম্ভাবনাকে যাচাই করে দেখছেন।

হরিয়ানার ভিরানা থেকে প্রাপ্ত যে প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে গোরু ছাগল ভেড়া হরিণের হাড় দাঁত ও সিং। বিশ্লেষণে উঠে এসেছে ভিরানার অধিবাসীরা এইসব পশুদের কীভাবে কাজে লাগাতেন সেই তথ্য। কিন্তু শুধু কার্বন ডেটিং (সি-১৪) পরীক্ষায় সন্তুষ্ট হতে পারেননি বিজ্ঞানীরা। প্রয়োগ করেছেন আরও আধুনিক অপটিক্যাল স্টিমুলেটেড লুমিনিসেন্স (ও এস এল) পদ্ধতি। আমেদাবাদের ফিজিক্যাল রিসার্চ ল্যাবরেটরিতে এই পরীক্ষা করেছেন ড. নবীন জুয়াল। তাতেই জানা গেছে প্রাচীন মানবের পা যেসব অঞ্চলে পড়েছিল ভিরানা তাদের অন্যতম। এখানকার মৃৎপাত্রগুলি অন্তত ছয় থেকে আট হাজার বছরের পুরনো।

খৃষ্টপূর্ব ৯ম থেকে ৭ম সহস্রাব্দ পর্যন্ত এই অঞ্চলে বৃষ্টির কোনো অভাব ছিল না। বরং অতি বৃষ্টির জন্য বন্যার প্রমাণ পাওয়া গেছে পার্শ্ববর্তী সমতলভূমিতে। সাম্প্রতিক গবেষণায় জানা গেছে ৭ম সহস্রাব্দের পর থেকেই বৃষ্টিপাত দুর্বল হয়ে পড়ে। খরা দেখা দেয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও এখানকার মানুষ ভরসা হারাননি। প্রতিকূল পরিস্থিতির সঙ্গে তারা নানা ভাবে মানিয়ে নিয়ে চলছিলেন। প্রচলিত খ্যাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন হচ্ছিল। গম-যবের মতো উচ্চফলনশীল খাদ্যশস্যের

পরিবর্তে ভুট্টাজাতীয় খাবারের প্রবর্তন করা হলো। এই পরিবর্তনের আর একটা কারণ ভুট্টায় জল কম লাগে। কিন্তু ভুট্টাচাষের ফলে গম-যবের জন্য নির্মিত শহরের বিরাট-বিরাট শস্যাগারগুলো ক্রমশ অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ল। এক সময় দেখা গেল সভ্যতা তার সুমহান সামাজিক এবং নাগরিক সত্তা হারিয়ে ব্যক্তি ও পরিবারকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে। প্রত্নতত্ত্ববিদরা বলছেন হরপ্পাসভ্যতা হঠাৎ ধ্বংস হয়নি। বস্তুত ধ্বংসই হয়নি। নগরায়ণের প্রক্রিয়া বন্ধ করে দিয়ে তারা প্রবেশ করেছিলেন গ্রামীণ জীবনে। তাদের ভাষা সাহিত্য বিজ্ঞান প্রযুক্তি সবকিছু নিয়ে তারা জন্ম দিয়েছিলেন এক অনুপম গ্রামসভ্যতার। তথাকথিত আর্যসভ্যতার।

ভিরানায় নগর সভ্যতার চিহ্ন।

১৯২০ সালে হরপ্পা সভ্যতা আবিষ্কারের পর থেকেই প্রত্নতত্ত্ববিদরা এই সভ্যতার উৎসের সন্ধান করছিলেন। প্রথম সন্ধান পাওয়া গেল ১৯৪৭ সালে, পাকিস্তানের কোট দিজিতে। তারপর ১৯৬০ সালে গুজরাটের কলিবঙ্গানে। সব শেষে ২০১৬-তে ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে। আদিপর্বের প্রতিটি কেন্দ্রই (তামিলনাড়ুর শিবগঙ্গা বাদে) গড়ে উঠেছে একটি বিশেষ নদী উপত্যকায়। যে নদীর নাম পাকিস্তানে হাকরা আর ভারতে সরস্বতী। কলিবঙ্গানের আশেপাশে বন্যাবিধৌত অঞ্চলে ড্রিলিং মেশিনের সাহায্যে মাটি খোঁড়ার সময় দুই প্রত্নতত্ত্ববিদ আর এল রাইকেস এবং আর কে কারান্থ মাটির নীচে এক ধরনের মোটা দানার ধূসর রঙের বালির সন্ধান পান, যা সাধারণত যমুনা নদীর খাতে পাওয়া যায়। আরও কিছু পরীক্ষার পর জানা যায় যমুনা এক সময় এই অঞ্চল দিয়ে প্রবাহিত হোত। বস্তুত যমুনা ছিল সরস্বতীর প্রধান সহায়ক নদী। সরস্বতীর জলপ্রবাহের একটা বড় অংশ আসত যমুনা থেকে। কিন্তু হিমালয়ের ভূ-ত্বকের কিছু পরিবর্তনের ফলে যমুনা উত্তর ভারতে সরে যায়। জলের জোগান বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সরস্বতী দুর্বল হয়ে পড়ে। এক সময় হারিয়ে যায়।

ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে সরস্বতী যে এক সময় প্রধান নদী ছিল এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। উপগ্রহ থেকে পাওয়া তথ্য, জল ও ভূতাত্ত্বিক গবেষণা, আইসোটপিক স্টাডি এবং সর্বোপরি ইসরো এবং নাসার সাম্প্রতিক চর্চায় তা প্রমাণ হয়েছে। হিমালয়ের উত্থান এবং তার জন্য শিবালিক পর্বতমালার পাদদেশে কিছু পরিবর্তনের ফলে ভারতের উত্তর-পশ্চিম ক্রমশ শুকিয়ে যায়। থর মরুভূমির সৃষ্টি হয়। নচেৎ এই অঞ্চলও ছিল সবুজ, নদীমাতৃক, শস্য শ্যামলা। এখানে একটা প্রশ্ন উঠতে পারে, হরপ্পা সভ্যতা সংক্রান্ত আলোচনায় সরস্বতী নদীকে এত গুরুত্ব দেবার কারণ কী? বেদে সরস্বতীর উল্লেখ আছে। যদি সরস্বতীর অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় তা হলে ভারতের সভ্যতার প্রাচীনত্ব সম্পর্কে ইতিহাস নির্দিষ্ট কালসীমা এক লাফে এনেকখানি পিছিয়ে যাবে। বৃটিশরা এদেশে তাদের শাসনের যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠা করার জন্য যে মিথ্যে আর্য আক্রমণ তত্ত্বের জাল বুনেছিল তার মূলোচ্ছেদ করা সম্ভব হবে। এমনকী আর্য আগমন তত্ত্বের অন্যতম প্রধান সমর্থক কমিউনিস্ট ঐতিহাসিকদেরও মোক্ষম জবাব দেওয়া যাবে। ১৯২০-২০১৬ এই দীর্ঘ সময় ধরে একদল ঐতিহাসিকের নির্লজ্জ চাটুকারবৃত্তি আমাদের প্রাচীন ইতিহাসকে ইতিমধ্যেই যথেষ্ট বিব্রত করে তুলেছে, এবার তাতে ছেদ টানা দরকার।

যাই হোক, সাম্প্রতিক প্রত্নতাত্ত্বিক অভিযান এবং তার আবিষ্কার যে হরপ্পাসভ্যতার অনেক রহস্য মোচন করতে সক্ষম হয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এমন অনেক তথ্য পাওয়া গেছে যা থেকে নিঃসন্দেহে প্রমাণ করা যায় ভিরানা-রাখিবাড়ি অঞ্চল ছিল সভ্যতার প্রধান কেন্দ্র। প্রত্নতাত্ত্বিক অধ্যাপক শিন্ডে বলছেন, 'আমার টিম দু'জায়গায় খনন কাজ চালিয়েছিল। প্রচুর বাড়ি আর সমাধিক্ষেত্র দেখেছি আমরা। তখনকার সংস্কৃতি, স্থাপত্য আর শিল্পোন্নত সমাজব্যবস্থার পরিচয় পেয়ে তাক লেগে গেছে সকলের।' ব্যবসাবাণিজ্যে খুবই উন্নত ছিল এই সভ্যতা। বস্তুত এই সভ্যতা ছিল বণিকের সভ্যতা। বৈদেশিক বাণিজ্য ছাড়াও, অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ছড়িয়ে পড়েছিল আধুনিক ভারতের মহারাষ্ট্র গুজরাট মধ্যপ্রদেশ অবধি। সভ্যতার আদিপর্বে বাড়ির ছাউনি হোত গোলাকার পরে তা চতুষ্কৌণিক হয়ে দাঁড়ায়।

নিঃসন্দেহে ভারত পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যদেশ। আমরা ১৩০ কোটি ভারতীয় সেই হরপ্পা সভ্যতার উত্তরাধিকারী। বাইরে থেকে অজস্র আক্রমণ হয়েছে আমাদের ওপর। কিন্তু ধ্বংস করা তো দূর কেউ আমাদের সংস্কৃতিতে হাত পর্যন্ত দিতে পারেনি। আমাদের সংস্কৃতি আত্মীকরণের, সমন্বয়ের। শত্রু হোক বন্ধু হোক— যে আসবে সে আর ফিরে যাবে না। মিশে যাবে এই সংস্কৃতিতে। এই দেশের নিরবচ্ছিন্ন চরৈবেতি চলতে থাকবে। দেশ আরও ঋদ্ধ হবে— মহৎ হবে।

(তথ্যসূত্র : অর্গানাইজার)

ইতিহাসের হারানো যোগসূত্র

নারকেল বীথির নীচে প্রাচীন শহর

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সঙ্গম যুগ কাকে বলে? সাধারণত দুটি গুরুত্বপূর্ণ যুগের মধ্যবর্তী সময়কে সঙ্গম যুগ বলা হয়। ইতিহাসে একাধিক সঙ্গম যুগের উদাহরণ থাকলেও প্রাগৈতিহাসিক এবং ঐতিহাসিক যুগের মধ্যবর্তী সঙ্গম যুগ গুরুত্বের বিচারে সর্বাধিক শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার। বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতে। এতকাল প্রত্নতাত্ত্বিকরা ইতিহাসের সেই হারানো যোগসূত্রের সন্ধান পাননি যার মাধ্যমে এই অঞ্চলের প্রাগৈতিহাসিক এবং ঐতিহাসিক যুগের মধ্যবর্তী সময়কে চিহ্নিত করা চলে।

সম্প্রতি সেই খেদ মিটল। আই আই টি খড়্গপুর এবং আর্কিওলজিকাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার উদ্যোগে ভারতের যে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান চালানো হয়েছে তার মধ্যে ছিল তামিলনাড়ুর শিবগঙ্গা জেলাও। মাটির নীচ থেকে পাওয়া প্রত্ন-নিদর্শনগুলি পরীক্ষা করে বিজ্ঞানী এবং প্রত্নতাত্ত্বিকরা অনুমান করছেন সম্ভবত খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে এই অঞ্চলে একটি সুবিশাল জনপদ গড়ে উঠেছিল। খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতক ইতিহাসের সঙ্গম যুগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সময়কাল। অর্থাৎ প্রত্নতত্ত্ববিদদের অনুমান সত্যি হলে প্রাচীন তামিল ইতিহাসের কালক্রমিক শূন্যতা অনেকাংশে পূরণ করা যাবে। সেই সঙ্গে সিন্ধু-সরস্বতী তীরবর্তী সভ্যতার সমান্তরাল যতগুলি নদীমাতৃক সভ্যতা ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল তাদের সমন্বয়সূত্র খুঁজে বের করা সহজসাধ্য হয়ে উঠবে।

গত বেশ কয়েক বছর ধরে তামিলনাড়ুতে খননকার্য চলছে। কিন্তু এবারের মতো তুঙ্গস্পর্শী সাফল্য মেলেনি। সংশ্লিষ্ট মহল মনে করছেন এই আবিষ্কার প্রাচীন তামিল ভাষাগোষ্ঠীর জীবনযাপন সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় সূত্রের সন্ধান দিতে পারে।

শিবগঙ্গা জেলার কিজহাড়ি অজ পাড়াগাঁ বললেও বেশি বলা হয়। কিন্তু এখন আর তা বলা যাবে না। ইতিহাসের লুপ্ত যোগসূত্রের সন্ধান দিয়ে কিজহাড়ি আপাতত ভারতের প্রাচীন সভ্যতার মানচিত্রে জ্যোতিষ্কের মতো উজ্জ্বল। আই আই টি খড়্গপুরের বিজ্ঞানীরা এবং আর্কিওলজিকাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার পুরাতত্ত্ববিদরা একযোগে খননকার্য চালিয়ে এখনও পর্যন্ত মোট ৪৮টি পরিখার সন্ধান পেয়েছেন যা এই অঞ্চলে হরপ্পা-মহেঞ্জোদড়োর সমতুল্য একটি সুবিশাল জনপদের অস্তিত্বের দিকে ইঙ্গিত করে। যার সম্ভাব্য সময়কাল খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতক অর্থাৎ সঙ্গম যুগ। ২০১৩-১৪ সালে আর্কিওলজিকাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া নিকটবর্তী কিলাড়ি গ্রামে প্রথম খননকার্য শুরু করে। ২০১৫ সালে বেশ কিছু মৃৎপাত্র এবং দেশি-বিদেশি একগুচ্ছ লৌহ নির্মিত জিনিসপত্র উদ্ধার করা হয়। ভাঙা মৃৎপাত্রগুলির কার্বন ডেটিং পরীক্ষা করে

খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকের কিজহাড়ি। এখানে ৪৮টি পরিখা পাওয়া গেছে।

তখনই প্রত্নতত্ত্ববিদরা জানতে পেরেছিলেন এগুলি খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে তৈরি। আরও জানা গিয়েছিল যে, এই অঞ্চল সে যুগের একটি বৃহত্তম বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল।

প্রথম পর্যায়ের পরীক্ষানিরীক্ষা শেষ হবার পরই প্রত্নতত্ত্ববিদরা নিশ্চিত হয়েছিলেন খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে কিলাড়ি ছিল একটি ব্যস্ত নগর। অথবা পরিব্যাপ্ত এক নগরসভ্যতার প্রাণকেন্দ্র। এরপর প্রত্নতত্ত্ববিদরা দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজে হাত দেন। শুরু হয় শিবগঙ্গা জেলার কিজহাড়িতে উৎখনন। প্রথম থেকেই প্রত্নতত্ত্ববিদদের নজর ছিল নারকেল গাছে ঘেরা একটি টিলার ওপর। সাড়ে তিন কিলোমিটার ব্যাসের, মোট ৮০ একর জমি জুড়ে থাকা নারকেলবীথির স্থানীয় নাম পাল্লিচাণ্ডাই থিডাল। এখানেই ঘুম ভেঙেছে ইতিহাসের। প্রত্নতাত্ত্বিকদের অনুমান, মাদুরাই নগর এবং আলাগানকুলাম বন্দরের মধ্যবর্তী এই প্রাচীন নগর উৎকৃষ্ট বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। পাণ্ড্যযুগের নানা শিল্পদ্রব্য আবিষ্কৃত হয়েছে, যার কারিগরী উৎকর্ষ চোখ ধাঁধানো এবং বিস্ময়কর। শিল্পদ্রব্যের মধ্যে রয়েছে কাচ, মুক্তো টেরাকোটা, পুঁতি দিয়ে তৈরি জিনিস। এছাড়া আছে ছোট ছোট মূর্তি, ছাতে লাগানোর জন্য ভাঁজ করা টালি এবং অজস্র মৃৎপাত্র। আর্কিওলজিকাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার বেঙ্গালুরু শাখার কার্যনির্বাহী প্রত্নতত্ত্ববিদ কে. অমরনাথ রামকৃষ্ণ বলছেন, 'এই সব শিল্পদ্রব্য থেকে লৌহযুগ ও ঐতিহাসিক যুগের আদিপর্বের মধ্যেকার হারানো যোগসূত্রের সন্ধান ছাড়াও সেই সময়কার সাংস্কৃতিক বিবর্তন সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ মিলতে পারে।' সুতরাং কিজহাড়ি শুধু তামিল সভ্যতা নয় সমগ্র ভারতীয় প্রেক্ষাপটেই মাইলফলক হয়ে উঠতে চলেছে।

দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ যখন শুরু হলো তখন বিশেষ কিছু বোঝা যায়নি। কাজ একটু এগোতে বোঝা গেল পাল্লিচাণ্ডাই থিডাল একটা বিশাল নগরের অংশবিশেষ। বস্তুত কিলাড়ি এবং কিজহাড়ির মোট আয়তন হরপ্পা-মহেঞ্জোদড়োর সমান। প্রত্নতত্ত্ববিদরা আরও একটি কারণে উচ্ছ্বসিত। সঙ্গম যুগের সাহিত্যে তামিলদের জীবনযাপনের যে তথ্যাদি পাওয়া যায় তা এতকাল ইতিহাস স্বীকার করেনি। উত্তর ভারতের সরস্বতীর মতোই জুটেছে অলীক তকমা। সাম্প্রতিক আবিষ্কার সেই তকমা ঘোচাতে সক্ষম হবে বলে প্রত্নতাত্ত্বিকদের ধারণা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, তামিল ভাষায় রচিত সঙ্গম যুগের সাহিত্যে দু' হাজার বছর আগেকার তামিল রাজাদের রাজ্যশাসন প্রণালী এবং ব্যক্তিগত জীবনযাপন প্রসঙ্গে সবিস্তার বর্ণনা রয়েছে। সেই সঙ্গে রয়েছে সাধারণ মানুষের কথাও। কিন্তু কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ না থাকায় এতকাল এই সাহিত্য শিক্ষিত সমাজের কলকে পায়নি। সম্ভবত এবার শাপমুক্তি ঘটবে।

কিলাড়ি-কিজহাড়ি নিয়ে একটু বেশি হৈচৈ পড়ে গেছে, কারণ দুটো কেন্দ্রই ছিল

- রাখিবাড়ি-ভিরানা থেকে পাওয়া নিদর্শন পরীক্ষা করার পর একথা নিঃসংশয়ে বলা চলে ভারতে আর্য বলে কোনো জাতি কখনও বাইরে থেকে আসেনি। আর্য শব্দটি গুণবাচক, জাতিবাচক নয়। ভারতের স্কুল- কলেজে ইতিহাসের পাঠক্রমে ৫০০০ বছর আগেকার যে আর্য আক্রমণ তত্ত্ব পড়ানো হয় তা সর্বৈব মিথ্যা এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। বস্তুত বৃটিশ এই তত্ত্বের আমদানি করেছিল। যাতে ভারতবাসী বিদেশি আর্যদের মতো তাদেরও শাসক হিসেবে মেনে নেয়।
- প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থে সরস্বতী নদী এবং তার তীরবর্তী জনপদগুলির উল্লেখ থাকলেও বৃটিশ প্রভাবিত এবং বামপন্থী ঐতিহাসিকরা তাকে মান্যতা দেননি। সরস্বতী নদীকে মুনিঋষিদের কল্পনা বলে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সাম্প্রতিক গবেষণা এবং আবিষ্কার সরস্বতীর অস্তিত্ব নিঃসন্দেহে প্রমাণ করেছে। সেই সঙ্গে এও প্রমাণ করেছে প্রাচীন হরপ্পা সভ্যতার অঙ্কুরোদগম ঘটেছিল সরস্বতী তীরবর্তী অঞ্চলে। পরে সেই সভ্যতা নানা দিকে ছড়িয়ে পড়ে।
- শিবালিক পর্বতমালা সংলগ্ন অঞ্চলে (তামিলনাড়ুর শিবগঙ্গায়) পাওয়া গেছে আরও দুটি প্রাচীন শহরের সন্ধান। শহর দুটি খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকের অর্থাৎ সঙ্গম যুগের (প্রাগৈতিহাসিক এবং ঐতিহাসিক যুগের মধ্যবর্তী) বলে বিজ্ঞানীদের অনুমান।
- বিশ্বের প্রথম মানবের জন্ম আফ্রিকায়। সাম্প্রতিক উৎখননে যে মানব-দেহাংশ আবিষ্কৃত হয়েছে তা থেকে বিজ্ঞানীদের অনুমান সত্যি বলে প্রমাণিত হলে আফ্রিকাকে ছাড়িয়ে যাবে ভারত। প্রমাণ করা যাবে শুধু সভ্যতার উদ্ভব বা বিকাশ নয় বিশ্বের আদিম মানবও সিন্ধু-সরস্বতীর তীর থেকে সভ্যতার ক্রমবিকাশের প্রয়োজনে বিশ্বের নানা দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল।

কিজহাড়ির সমাজ শহর কিলাড়ি।

প্রাচীন মানুষের বাসভূমি। এখানকার ইট পরীক্ষা করে দেখেছেন প্রত্নতত্ত্ববিদরা। বিভিন্ন আকৃতির (৩৬ × ২২ × ৫ সেমি, ৩৮ × ২২ × ৬ সেমি, ৩৪ × ২১ × ৫ সেমি) ইট পাওয়া গেছে। ইটের আকৃতির বিভিন্নতা সঙ্গম যুগের জীবনশৈলীর পরিচয় জ্ঞাপন করে। অমরনাথ রামকৃষ্ণ বলেছেন, 'প্রাথমিক পরীক্ষানিরীক্ষার পর আমাদের অনুমান এসব ইট খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে অর্থাৎ আড়াই হাজার বছর আগে তৈরি হয়েছিল। যদিও কার্বন ডেটিং পরীক্ষা না করে সঠিক তারিখ বলা সম্ভব নয়।' প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, অমরনাথ রামকৃষ্ণ গুজরাটের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সিন্ধু-সরস্বতী সভ্যতার উৎস সন্ধানে কাজ করেছেন।

এর আগে আর্কিওলজিকাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার পুরাতত্ত্ববিদরা তামিলনাড়ুর বিভিন্ন জায়গায় প্রাচীন সভ্যতার সন্ধান করেছেন।

কিলাড়ির ধ্বংসাবশেষ।

যার মধ্যে রয়েছে নাগাপাত্তিনাম জেলার কাবেরীপুমপাত্তিনাম, ত্রিচি জেলার উরাইউর, তিরুনিভেলি জেলার আদিচানালুর এবং পুদুচেরির আরিক্কামেড়ু। চোলযুগে কাবেরীপুমপাত্তিনাম ছিল বিখ্যাত সমুদ্রবন্দর। সে যুগের অন্যতম প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। আদিচানালুরে পুরাতত্ত্ববিদরা একটি সমাধিক্ষেত্র থেকে প্রাচীন তামিল-ব্রাহ্মী লিপিতে লেখা কয়েকটি শিলাফলক আবিষ্কার করেছেন।

ভারতের ইতিহাসে অবান্তর আর্য আগমন প্রসঙ্গ বাদ দিলে আমরা দুটি মহান সংস্কৃতির মুখোমুখি হব— অসুর ও রাক্ষস। ভারতীয় সংস্কৃতি এই দুয়ের মেলবন্ধন। এর মধ্যে বিদেশি উপাদান এক কণাও নেই। বিদেশিরা এসে বিজাতীয় উপাদান ঢোকাতে সচেষ্ট হয়। যার মধ্যে প্রধান আর্য আগমন তত্ত্ব। এই একটি তত্ত্বের মাধ্যমে অসুর ও রাক্ষসদের উড়িয়ে দেবার চেষ্টা শুরু হয়। বলা হয় আর্য ইন্দ্র অসুরদের পুর অর্থাৎ নগর ধ্বংস করেছিলেন বলে তার নাম পুরন্দর। অথচ আজ এটা প্রমাণিত যে, নানা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়ে বিলাসবহুল নাগরিক জীবন ছেড়ে প্রাচীন মানুষরাই গ্রামীণ জীবনের দিকে ঝুঁকেছিলেন। ভোঁতা অর্থে যাতে কম খরচে সংসার চালানো যায়, তার ব্যবস্থা করেছিলেন।

তামিলনাড়ু সহ ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে পুরাতত্ত্ববিদদের সাম্প্রতিক আবিষ্কারগুলি প্রকৃত শিকড়ের সঙ্গেই আমাদের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে। আরও অনেক পথ এখনও বাকি। আরও অনেক কাঁকর বাছাও বাকি। কিন্তু সরকারের সদর্থক ভাবনাচিন্তা এবং ভারতীয় পুরাতাত্ত্বিকদের কর্মকুশলতা দেখে একটা কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, একদিন ভারত তার নির্ভেজাল প্রকৃত ইতিহাস ফিরে পাবে। যে ইতিহাস একইসঙ্গে গর্বের এবং বিস্ময়ের। ■

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখপত্র

প্রণব

পড়ুন ও পড়ান

চিঠিপত্র

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

ভারতীয় জনতা পার্টির পশ্চিমবঙ্গের সভাপতি শ্রী দিলীপ ঘোষ মহাশয় কয়েকদিন আগে উক্তি করেছেন, 'যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা বেহায়া ও নিম্নস্তরের।' মনে হয় তাড়াহুড়োয় বলা হলেও উক্তিটি আংশিক সত্য।

যেদিন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা যাদবপুর থানার সামনে উদ্দামভাবে নাচানাচি করে বলছিল, ''চুমু চুমু চুমু চাই, চুমু খেয়ে বাঁচতে চাই'' তখন অশীতিপর এই বৃদ্ধের নজরে তাও পড়েছিল এবং জীবনে দেখা সমস্ত কুদৃশ্যের মধ্যে নিকৃষ্টতম রূপে প্রতিভাত হয়েছিল।

আমার এক দৌহিত্রি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তুইও কি এই স্লোগান দিয়েছিলি? সে উত্তরে বলেছিল 'না'। আমার সঙ্গে দৌহিত্রি হিসাবে হাস্যপরিহাসের সম্পর্ক থাকলেও সে ওই স্লোগানে তার আপত্তির কথা জানিয়েছিল। অর্থাৎ তার তা রুচিবিরুদ্ধ মনে হয়েছিল। তাহলে তারা কেন সকলে ওই স্লোগানের বিরুদ্ধে একত্রিত হয়ে মিডিয়াকে জানায়নি যে তারা এই স্লোগানের সঙ্গে সহমত নয় এবং তারা জনসাধারণের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী?

অনেক সময় ব্যষ্টির দোষে সমষ্টিও দোষায়িত হয়। তাই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের কাছে অনুরোধ— আপনারা সংগঠিত হোন ক্ষতি নেই, কিন্তু নিজেদের আচরণের রুচিকে সারমেয়শ্রেণীর প্রাণীর স্তরে ক্রমে ক্রমে নামিয়ে আনবেন না।

—হৃষীকেশ কর,
অনুলিখন : যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
যাদবপুর, কলকাতা।

'আমারও দারুণ ভালো লাগলো'

মেট্রোরেলে আমার পাশে বসেছিলেন ভদ্রলোক। পরনে পাজামা-পাঞ্জাবি, কাঁধে গেরুয়া রঙের কাপড়ের ব্যাগ। আমি পড়ছিলাম 'স্বস্তিকা'। আগে শনিবার পেতাম, এখন পাচ্ছি বৃহস্পতিবার। আদ্যোপ্রান্ত পড়ি, সঠিক বক্তব্য, সঠিক ধরনে। আজ থেকে 'স্বস্তিকা' পড়ছি না, বহুকাল ধরে পাঠ করে আসছি। পাঠে তৃপ্ত, লিখে গর্বিত, শারদীয়া সংখ্যা সম্পদ-স্বরূপ। ভদ্রলোক আমার দিকে দু'একবার তাকিয়ে ঈষৎ হেসে বললেন, কী পত্রিকা পড়ছেন? বললাম 'স্বস্তিকা'। তিনি আবেগাপ্লুত হয়ে বললেন, এ সপ্তাহেরটা বেরিয়ে গেছে? বললাম হ্যাঁ, আজই বেরিয়েছে। একটু দেখতে দেবেন? মনোনিবেশ সহকারে দেখতে লাগলেন। নামার সময় হতে চেয়ে নিলাম। তিনি ফেরত দেবার সময় শুধু বললেন, 'দারুণ পত্রিকা'। শুনে আমারও দারুণ ভালো লাগলো।

—অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়,
১, পার্কস্ট্রিট, কলকাতা-১৬।

ধর্মান্তরিত মুসলমানদের স্বধর্মে ফেরা একান্ত মঙ্গল

একদা কৌলিন্য প্রথা ও হিন্দু ব্রাহ্মণদের কুপ্রথার প্রভাবে ভারতে বসবাসকারী অনেক হিন্দু এক কথায় বাধ্য হয়েই দলে দলে ধর্মপরিবর্তন করে এবং মুসলমান হয়ে যায়। তাতে সাময়িক কিছু লাভ হলেও, দিন যতই এগোচ্ছে ততই এই ধর্মপরিবর্তনকারীরা সমাজের কাছে ঘৃণ্য হয়ে পড়ছে। ধর্ম-পরিবর্তনকারীদের নয়, এর দায় আমাদের ভারতে বিগত ৭০ বছরের রাজনীতিতে যে তোষণ চলছে তার। ভারতে বসবাসকারী মুসলমানদের উৎসাহ জুগিয়ে চলেছে কংগ্রেস ও বিকৃত মস্তিষ্কের কমিউনিস্ট সেকুলারদের দল। শুধু এখানেই তারা থেমে নেই, তারা আবার তাদের নতুন পরিচয় দিয়েছে সংখ্যালঘু। ভারতে থেকে ভারতীয়দের ক্ষতি করা মুসলমান সমাজের এটি শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি। এই সংখ্যালঘু পরিচয় দিয়ে শিক্ষায় যে অন্ধকারের কালো মেঘে ভরিয়ে দিয়েছে ৭০ বছরের রাজনৈতিক কারবারিরা, সাচার কমিটির রিপোর্ট তার এক প্রমাণ্য দলিল। আর এই অশিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে ফায়দা তুলছে রাজনৈতিক ধান্দাবাজরা। এ প্রসঙ্গে ভারতে মুসলমানদের জন্য শরিয়তি আইনের ব্যাপারটি উলেখ্য। কারণ শরিয়তি আইন ও অশিক্ষা এই দুটি অস্ত্র ধর্মান্তরিতদের মাথায় এমন সুকৌশলে বসানো হয়েছে যার মাশুল তাদের দিতে হচ্ছে। যেমন ভারতে বসবাসকারী ধর্মান্তরিত মুসলমানদের শিক্ষার মান একেবারে নিম্নমানের এবং অতি অল্প বয়সে মেয়েদের বিয়ে দেওয়া হয় তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে। অশিক্ষিত বা স্বল্পশিক্ষিত স্বামীদের কাছে আবার পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনার মতো তালাক প্রথা একটা হাতিয়ার। তাদের কাছে নারী স্রেফ সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র। তাই বহু মুসলমান মেয়েকে ১৪-১৫টি বাচ্চার মা হতে হয়। এই ১৪-১৫টি বাচ্চার ভরণপোষণ, শিক্ষা কোনো মা-বাবাই সঠিকভাবে করতে পারে না। ফলে ওই বাচ্চারা বিপথে পরিচালিত হয়। কারণ পেটের দায়ই এদের বিপথে পরিচালিত করে। সমগ্র বিশ্বে যখন জন্মনিয়ন্ত্রণ হয়েছে কড়া আইনের সাহায্যে, ভারতে কিন্তু শরিয়তি আইনের দোহাই পেড়ে একজন ধর্মান্তরিত বাবা আব্বা হয়ে ২০-২৫টি সন্তানের জন্ম দিয়েছে। এরকম ঘটনা আমাদের পশ্চিমবাংলাতেই রয়েছে। তাই আজ দাড়ি রাখা টুপি-পরারা ভীষণ সন্দেহজনক সবার কাছে। আর বোরখা পরার রীতি কী জঘন্য তা বোরখাপরিহিত জনেরাই জানেন। অনেক জায়গায় ধর্মান্তরিতরা প্রকৃত শিক্ষা এবং জ্ঞানের আলোকে নিজেকে উন্মোচিত করার জন্য সনাতন ভারতীয় ধর্মে আবার ফিরে আসছে। কারণ তাদের পূর্বপুরুষরা ছিলেন সব হিন্দু। তাদের শিরায়-ধমনীতে বইছে হিন্দুরক্ত। তাই ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মাধ্যমে আজও বহু ধর্মান্তরিত মানুষ হিন্দু যাঁরা বাধ্য হয়ে মুসলমান সেজেছিলেন তাঁরা নিজধর্মে ফিরে

আসছেন। এতে তাদের নিজেদের চরম মঙ্গল নিজেরাই করছেন। তাই ভারতে বসবাসকারী মুসলমানদের আর ছদ্মবেশ ধারণ না করে সমাজের ঘৃণার পাত্র না হয়ে স্বধর্মে ফিরে যাওয়াই শ্রেয়। অন্যথায় তারা না পারবে কাক হতে না পারবে ময়ূর সাজতে। তাই অতি সত্বর স্বধর্মে ফেরা মুসলমান সমাজের পক্ষে একান্ত মঙ্গল।

—আয়েসা খাতুন,
ডুমুরজলা, হাওড়া।

ইসলামিক অসহিষ্ণুতা

সময় যত এগিয়ে চলেছে, সমাজ যত উন্নত হচ্ছে, ইসলামি স্টেটস (আই এস)-এর জঙ্গিরা তত এই পৃথিবীর বুকে তাদের সুপরিকল্পিত সন্ত্রাস কায়েম করতে চাইছে। বিশ্বের সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন একটা বড় অংশ যখন তাদের নিরলস পরিশ্রমের মাধ্যমে প্রগতি ও শান্তির বাতাবরণ তৈরি করতে চাইছেন, বলা ভালো, সমাজকে গড়তে চাইছেন, তখন এই উগ্র ও ধ্বংসাত্মক মনোভাবাপন্ন ইসলামের ধ্বজাধারীরা সমাজটাকে অশান্তির আবহে মুড়ে ফেলতে চাইছে। কোনো সভ্য সমাজে এই মৌলবাদীদের অত্যাচারকে বেড়ে উঠতে দেওয়া উচিত নয়। বাস্তবিকই তারা ক্রমাগত যা করে চলেছে তা একপ্রকার অসভ্যতা। সাধারণ মানুষকে বন্দি করা, তাদের দিনের আলোয় নৃশংসভাবে হত্যা করা ও সেই ছবি ভিডিও, সোশ্যাল মিডিয়ায় তুলে ধরা— এগুলি নিঃসন্দেহে নির্লজ্জতার প্রতিচ্ছবি। বিশ্বের উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলিতে তারা নিজেদের আধিপত্য কায়েম করতে চাইছে গায়ের জোরে সন্ত্রাসের মাধ্যমে। মানুষ খুন করে, তাদের অঙ্গ- প্রত্যঙ্গগুলি আলাদা করে সেগুলির ছবি প্রকাশ করা হচ্ছে এবং সেগুলির দায় নিজেরা নিয়ে বাহবা পেতে চাইছে অসভ্য সমাজের মানুষরূপী দস্যুরা। অন্যদিকে ভারতের হিন্দু সংস্কৃতি অনেক উদার, সহিষ্ণু ও সুন্দর। এখানে একথা উল্লেখের প্রাসঙ্গিকতা হলো— আই এস-এর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বিচ্ছিন্নতাবাদীরা হিন্দু সংস্কৃতির উদারতার সুযোগ নিয়ে তাদের লালসার থাবা নোংরা উপায়ে ভারতের উপর বসাতে চাইছে। অসহিষ্ণুতার মূর্ত প্রতীক হলো এই আই এস— এটা তর্কের অতীত। খুব সাম্প্রতিক একটি ঘটনায় ভারতের হিতাকাঙ্ক্ষীরা নড়েচড়ে বসেছেন। যে রামকৃষ্ণ মিশন পৃথিবী জুড়ে প্রতিবন্ধকতার সঙ্গে লড়াই করে তাদের সেবাকার্য চালিয়ে যাচ্ছেন, যে রামকৃষ্ণ মঠের সন্ন্যাসীরা তাদের কাজের মাধ্যমে গোটা বিশ্বে ভারতীয় সংস্কৃতি ছড়িয়ে দিচ্ছেন, স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শকে সকলের কাছে তাদের মতো করে প্রচার করছেন; সেই মিশনের বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার শাখাতে সম্প্রতি একটি খুনের হুমকি সম্বলিত পত্র পাঠানো হয়েছে আই এস-র পক্ষ থেকে। সেই চিঠিতে বলা হয়েছে যে, তারা যেন অতি শীঘ্র তাদের পূজা-অর্চনা ও সেবাকাজ বন্ধ করে দেশে ফিরে যান, আর না গেলে হত্যা করা হবে আই এস-এর পক্ষ থেকে। একথা সর্বজনবিদিত ও বহুলকথিত যে, হিন্দুরা এতটাই উদার যা তাদের প্রায়শই আত্মবিস্মৃত ও অসংগঠিত জাতে পরিণত করেছে। আর এসব সুযোগ হাতছাড়া না করে নির্বিচারে এই ইসলামিকরা হিন্দু পরিবারগুলিকে বেছে বেছে আক্রমণ করছে। স্বাধীনতার সময়ে বাংলাদেশের হিন্দু জনসংখ্যার হার ছিল ৩৩ শতাংশ, আজ তা ৮ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে। মুখে বাংলাদেশ আর পাকিস্তানের মতো উগ্র মুসলিম অধ্যুষিত দেশগুলি যাই বলুক না কেন, হিন্দু বিতাড়নই হলো তাদের একমাত্র লক্ষ্য। যদি ইসলাম এতটাই উদার হবে তো ভারতীয় মুসলমানরা তো একবারও এই ঘটনার নিন্দা করেন না বা দুঃখ প্রকাশটুকুও করেন না। ভারতের মধ্যেই উত্তরপ্রদেশের কৈরানাতে শতাধিক হিন্দু পরিবারকে উৎখাত করা হয়েছে, হিন্দু ব্যবসায়ীদের হত্যা করা হয়েছে, কোনো স্বাধীনচেতা ও তথাকথিত চিন্তাশীল মানুষ যাঁরা তাঁদের গলা ফাটিয়ে ফেলেন কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে সিনেমা দেখানো, সেখানকার ধর্মনিরপেক্ষ বক্তৃতা, কোনো সিনেমার মুক্তিতে বাধার বিরোধিতা ইত্যাদি প্রসঙ্গে, তাঁরা একবারের জন্যও এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করেন না। প্রতিরোধ তো দূরের কথা। কোনো সুস্থবুদ্ধিসম্পন্ন মুসলমান নিশ্চয়ই এধরনের ঘটনায় সক্রিয় ভূমিকা নিতেন যদি মুসলমান পরিবারগুলিকে অন্যত্র যেতে হতো। সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুরা ভারতের সংখ্যালঘুদের দ্বারা অত্যাচারিত হচ্ছে— এ বোধহয় হিন্দু সমাজেই সম্ভব। দুচোখ ভরে ভারতবর্ষের হিন্দুরা দেখছে, কেউ কেউ প্রতিবাদ করছে। কিন্তু সম্মিলিতভাবে হিন্দুরা প্রতিরোধ গড়ে তুলছে না। যে কোনো ভাবেই হোক হিন্দুদের একজোট হতে হবে। না হলে বিপদ অবশ্যম্ভাবী। সকল হিন্দুর ভাবা উচিত, এটা গণতন্ত্রের উদারতা নয়, নিজেদের প্রতি উদাসীনতা।

অত্রি মল্লিক,
৫ এন বসু রোড, ডাক ও জেলা বর্ধমান।

দাদাঠাকুর

দাদাঠাকুর শরৎচন্দ্র পণ্ডিত মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র বিনয়কুমার একবার স্কুলের 'টেস্ট' পরীক্ষায় পাশ করতে পারেননি। তাঁর সহপাঠী, মহকুমা শাসকের ভাইপোও পাশ করতে পারেনি। উপরন্তু সে বিনয়কুমারের চেয়ে অনেক কম নম্বর পেয়েছিল। দাদাঠাকুর তা জানতেন। দুদিন পরে, বিনয়কুমার দাদাঠাকুরকে জানায়, গ্রেস নম্বর দিয়ে কিছু ছাত্রকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেবার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। ওই খবর শুনে দাদাঠাকুর প্রধান শিক্ষক মহাশয়কে কঠোরভাবে বলেছিলেন— গ্রেস নম্বর দিয়ে যদি বিনয়কে পরীক্ষা দেবার সুযোগ দেওয়া হয় তাহলে তিনি ওপরওয়ালা ডি পি আই-কে এই অসৎ কাজের কথা জানাবেন। প্রধান শিক্ষক ঘাবড়ে গিয়ে মহকুমা শাসককে সব কথা জানান। স্কুলের প্রেসিডেন্ট ছিলেন মহকুমা শাসক স্বয়ং। সব শুনে তিনি প্রধান শিক্ষককে নিষেধ করেন, যেন নম্বর দিয়ে পাশ করানো না হয়। কারণ, তিনি দাদাঠাকুরকে জানতেন।

(তথ্যসূত্র : 'সেরা মানুষ দাদাঠাকুর' - নির্মলরঞ্জন মিত্র)।

বিমলেন্দু ঘোষ,
পর্ণশ্রী পল্লী, কলকাতা - ৬০

পুরাকীর্তির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন শুশুনিয়া

বিপ্লব বরাট

ধর্মভূমি ভারতবর্ষে পশ্চিমবঙ্গের একটি ক্ষুদ্র জেলা বাঁকুড়া। ক্ষুদ্র হলেও এই জেলার মাহাত্ম্য ও গৌরব কোনো অংশে কম নয়। এই জেলা প্রাচীন সংস্কৃতির ধারা বহন করে চলেছে। পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনাদি আবিষ্কারের যে প্রবহমান ধারা বাঁকুড়া জেলায় দেখা যায়, তার ভিত্তিতে নিঃসন্দেহে বলা যায় প্রায় লক্ষাধিক বছর আগে এই ক্ষয়িষ্ণু শুশুনিয়া গিরি উপত্যকায় সনাতন সংস্কৃতিভাবাপন্ন আর্যদের বাসভূমি ছিল। প্রাগৈতিহাসিক সাংস্কৃতিক স্তরের আদি পর্বেই বঙ্গের এই অঞ্চলে মানব সভ্যতার ইতিহাস সূচিত হয়। বাঁকুড়া জেলা শহর থেকে পশ্চিমমুখী পুরুলিয়া রোডে ২৪ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত শুশুনিয়া পাহাড় (জে. এল. নং ৮৫)। পাহাড়ের উচ্চতা ১,৪৪২ ফুট। প্রত্নস্থলটি ছাতনা থানার অন্তর্গত। শুশুনিয়া শব্দটি এসেছে শিশুনগ (নগ শব্দের অর্থ হস্তী) থেকে। দূর থেকে শুশুনিয়া পর্বতকে দেখলে মনে হয়, যেন একটি হস্তীশাবক শুঁড় বিস্তার করে শুয়ে আছে। আবার পাহাড়ের দক্ষিণ পাদদেশে একটি পাথরে খোদিত নৃসিংহ মুখ হতে অবিরাম বেগে ঝরে পড়ছে ঝরনার জল, এই সুশনি জলজ শাখা থেকে শুশুনিয়া নামকরণ হতে পারে। গিরি ঝরনায় রামায়ণের প্রস্তর চিত্র দেখা যায়। হনুমান নতজানু হয়ে রাম-লক্ষ্মণ-সীতার কাছে বসে আছেন। সীতার দক্ষিণ হস্তে কমণ্ডলুর মতো কিছু ধরা আছে। আয়তাকার এই চিত্রটি অষ্টম শতকে খোদিত। সনাতন ধর্মের প্রভাব এতে লক্ষ্য করা যায়। জনশ্রুতি আছে, মধ্যযুগীয় কবি বড়ু চণ্ডীদাস (শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন রচয়িতা) শুশুনিয়া ঝরনার জলে স্নান করে ও ঝরনার জল নিয়ে ছাতনা রাজকুলদেবী বাসলী বিশালাক্ষী-র পুজো করতেন।

শুশুনিয়া পাহাড়ের গায়ে মারাংঢেরী গুহা, ভালুকগুহা ও ভরতপুর গুহা— মোট তিনটি গুহা আছে। বাঁকুড়ার আদি ঐতিহাসিক পর্বের ইতিহাস চর্চার সর্বাপেক্ষা আলোচিত উপাদান শুশুনিয়া পাহাড়ের গায়ে উৎকীর্ণ সংস্কৃত ভাষায় ও গুপ্ত ব্রাহ্মী লিপিতে লিখিত শিলালেখ এবং সেই লেখের তথ্যনির্ভর পুরাতাত্ত্বিক অনুসন্ধান। এই পাহাড়ের খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকের বিখ্যাত গুহালিপি থেকে জানা যায়, মহারাজ সিংহবর্মনের পুত্র মহারাজ চন্দ্রবর্মন পুষ্করণার অধিপতি ছিলেন। পুষ্করণাই যে আজকের দামোদর তীরস্থ পখন্না সে বিষয়ে পণ্ডিত মহলে কোনো দ্বিমত নেই। আর্কিওলজিক্যাল সার্ভের ১৯২৭-২৮ খৃষ্টাব্দের বার্ষিক রিপোর্টে কে এন দীক্ষিতের মতে, ''গ্রামের পশ্চিম অংশে এক বড় দীঘির (পোখর বা পুষ্কর) কাছে কয়েকটি ছোট জলাশয় দেখা যায়। সন্দেহ নেই, দূর অতীতের এই বড় পুষ্করিণীটি থেকে পখন্না নামটি এসেছে।'' অতীতের রাজপ্রাসাদ, গড়, এবং সমৃদ্ধ জনপদসহ এই পুষ্করণার অধিকাংশই দামোদর নদের গর্ভে মিশে গিয়েছে। বর্তমানে গ্রামটি বড়জোড়া থানার অন্তর্গত। এখানে পাওয়া গিয়েছে মৌর্যযুগের গার্হস্থ্য প্রত্নসামগ্রী, পালযুগের একটি কষ্টিপাথরের বিষ্ণুমূর্তি, ছাঁচে ঢালা তাম্রমুদ্রা প্রভৃতি। শুশুনিয়া গুহার দেওয়ালে উৎকীর্ণ প্রথম লিপিটি হলো ''চক্রস্বামিন দাসাগ্রেনাতি সৃষ্ট। পুষ্করণাধিপতে মহারাজ শ্রী সিংহ বর্মনস্য পুত্র মহারাজ শ্রী চন্দ্র বর্মন কৃতি।'' অর্থাৎ চক্রধারী দেবতার প্রধান সেবক পুষ্করণার অধিপতি শ্রী সিংহ বর্মনের পুত্র শ্রী চন্দ্র বর্মন (বিশেষ কোনো কীর্তি) উৎসর্গ করলেন।

সিংহবর্মন সম্ভবত খৃষ্টীয় তৃতীয় শতকের শেষ দিকে ও চন্দ্র বর্মন চতুর্থ শতকের প্রথমে রাজত্ব করেন। তাঁদের রাজ্যসীমা সঠিকভাবে নির্ধারিত না হলেও ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর সম্পাদিত 'হিস্ট্রি অব বেঙ্গল' গ্রন্থে (প্রথম খণ্ড) বিশেষ দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন যে, পুষ্করণা-অধিপতি চন্দ্র বর্মনের শাসন পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর জেলা অবধি বিস্তৃত ছিল। শুশুনিয়া দ্বিতীয় লিপিটি একই হরফে লিখিত ও তার পাঠ নিম্নরূপ : 'চক্রস্বামিনো ধোসোগ্রামোত্রিসৃষ্ট'। অর্থাৎ ধোসোগ্রাম নামক পল্লী চক্রস্বামীকে উৎসর্গ করা হলো। শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী বাসুদেব বা বিষ্ণুরই অপর নাম চক্রস্বামী। শুশুনিয়া গিরি শিখরের দুর্গম গুহাগাত্রে খোদিত লিপি দুটি দেখে প্রাচীন আর্যাবর্তের হিন্দু রাজার সু-শাসন ও সংস্কৃত ভাষার বিকাশের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গের পূর্ত বিভাগের তৎকালীন অধিকর্তা পরেশচন্দ্র দাসগুপ্তের নেতৃত্বে ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে শুশুনিয়া পাহাড় পরিমণ্ডলে খননকার্য চালান।'' এখান থেকে প্রত্নাশ্মর, ক্ষুদ্রাশ্মর, মধ্যাশ্মর, নবাশ্মর আয়ুধের আবিষ্কার হয়েছে। আদি প্রস্তর যুগের বর্শাফলকের আকৃতি ও ডিম্বাকৃতি হাতিয়ার, হাত কুঠার, আদি প্রস্তর কালের হাতিয়ার, নবাশ্মীয় সেন্ট বেলেপাথর ডলোরাইট প্রভৃতি পাথরের তৈরি নিদর্শন পাওয়া গেছে।'' গবেষকদের ধারণা এখানে প্লিস্টোসিন যুগের হাতি, ঘোড়া, মহিষ প্রভৃতি প্রজাতি বসবাস করত এবং শুশুনিয়া অঞ্চলে জৈন ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির প্রভাব ছিল। বর্তমানে শুশুনিয়ায় রয়েছে পর্বতারোহণ (Rock Climbling) প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র। তাছাড়া এই অঞ্চল রাজ্যের অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র এবং এখানকার পরিবেশ মনোরম ও স্বাস্থ্যপ্রদ। শ্রাবণমাসে এখানে মেলা বসে। শুশুনিয়া অঞ্চল পাথর শিল্পের জন্য বিখ্যাত। শুশুনিয়া শিলালেখটি তারের জাল দিয়ে বন্ধ করে রেখেই দায় সারা হয়েছে। সেখানে যাবার ম্যাপ বা নির্দেশক বোর্ডের প্রয়োজন। এ সকল পুরাসম্পদ আজো অবহেলিত।

কাজী নজরুল ইসলাম ও শ্যামাসঙ্গীত

সুদীপ্ত কর

বাংলার তথা ভারতের গর্ব রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল। দু'জনের জন্মই মে মাসে কিন্তু বয়সের ব্যবধান আটত্রিশ। রবীন্দ্রনাথের আয়ুষ্কাল আশি, নজরুলের সাতাত্তর। উভয়ের তিরোধান আগস্ট মাসে। এই দু'জনেই ছিলেন পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতীক। কাজী নজরুল ইসলামের জীবনের মতো তার সৃষ্টিও বর্ণময়। তাঁর উল্লেখযোগ্য সম্পাদনা অর্ধসাপ্তাহিক কাগজ 'ধূমকেতু' প্রকাশিত হলো ২৬ শ্রাবণ ১৩২৯ (১১ আগস্ট ১৯২২)। নজরুল ইসলাম পাঠককূলকে জানালেন 'ধূমকেতু কোনো সাম্প্রদায়িক কাগজ নয়' এবং 'দেশের যারা শত্রু, দেশের যা কিছু মিথ্যা, ভণ্ডামি, মেকি তা সব দূর করতে ধূমকেতু হবে সমমার্জনী।' ধূমকেতুর প্রথম সংখ্যার প্রথম পাতায় পত্রিকার নামের নীচেই রবীন্দ্রনাথ প্রেরিত আশীর্বাণী মুদ্রিত হয়— 'আয় চলে আয়, রে ধূমকেতু, আঁধারে বাঁধ অগ্নিসেতু...'।

কাজী নজরুল ইসলামের কাব্যপ্রতিভা যেমন ব্যতিক্রমী তেমনই তাঁর সঙ্গীত রচনাও ব্যতিক্রমী। আর নজরুল ইসলামের শ্যামাসঙ্গীত তাঁকে এক অনন্য মাত্রা দিয়েছে। 'কাল' অর্থাৎ সময় থেকেই কালী নামের উদ্ভব। মা কালীর মধ্যে আমরা বিদ্রোহী মাতার রূপ দেখতে পাই। একদিকে যেমন অশুভ বিনাশী অন্যদিকে সৃষ্টি ও সৌভাগ্যের দেবী হিসাবে তিনি চিহ্নিত। আবার শায়িত শিব এই প্রতিচ্ছবির কথা স্মরণ করায় যে মা কালী প্রাচীন নারী বিদ্রোহের প্রাথমিক নারী আন্দোলনের প্রতীক হিসাবেই পূজিতা। স্বাভাবিক কারণেই বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের চর্চার মূল কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে শ্যামাসঙ্গীত রচনা।

আমরা যদি নজরুলের গানের শিকড়ের সন্ধান করি তাহলে খুঁজে পাব চুরুলিয়া গ্রামের প্রভাব। চুরুলিয়া গ্রামে ছিল অনেক দেবদেউল,

সমাধি, মন্দির, মাজার প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মীয় আচরণের নিদর্শন। এখনো জীর্ণ দশাতে সেগুলি বিদ্যমান। এমনকী এই গ্রামে ফকির, দরবেশ, তান্ত্রিক, সাধু-সন্ত, ভিক্ষুদের বারবার ভিড় জমেছে। চুরুলিয়ায় শ্মশানকালীর বিশেষ পূজা হোত। আর জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী (১৯০২-১৯৫৯)-র কণ্ঠে মালকোষ রাগে 'শ্মশানে জাগিয়ে শ্যামা' গানটি অনুপ্রাণিত করেছিল কবিকে। পরবর্তীকালে পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও অসুস্থ নজরুল ইসলামকে সাহায্য করেছিলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী (১৯০১-১৯৫৩) ও শৈলজানন্দ মুখার্জী (১৯০৯-১৯৭৬)। নজরুল সুহৃদদের অবদান ও শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর সহযোগিতা না থাকলে আজ আমরা নজরুল ইসলামের অনেক সমৃদ্ধ প্রতিভার হিসাবই পেতাম না।

কাজী নজরুল ইসলামের ভক্তিগীতির সংখ্যা প্রায় ১১৬০। ত্রিশের দশকে তিনি ২/১টি শ্যামাসঙ্গীত রচনা করলেও ১৯৩৫ থেকে পূর্ণোদ্যমে চালিয়ে যান এবং শিখরে ওঠেন ১৯৩৮/১৯৩৯ সালে। এমনকী অসুস্থ অবস্থায় ১৯৪৫-১৯৫০ পর্যন্ত গান রেকর্ডিং অব্যাহত রেখেছিলেন। শ্যামাসঙ্গীত রচনায় তিনি যে রাগ-রাগিনীর ব্যবহার করেছেন তাও বৈচিত্র্যময়। মালকোষ, শঙ্করী, কাফি, সারং-জয়ন্তী, দুর্গা, কানাড়া, মেঘ, শিবমত-ভৈরব, রুদ্র-ভৈরব, মুলতান, বিভাষ, তিলং, নট-নারায়ণ, আনন্দ-ভৈরবী প্রভৃতি প্রচলিত-অপ্রচলিত রাগে অসাধারণ মুন্সীয়ানার পরিচয় তাঁর রচিত শ্যামাসঙ্গীত।

তিনি কালী ও দুর্গা উভয়কেই নানারূপে দেখেছেন। আমরা যদি পর্যালোচনা করি তার কয়েকটি মাহাত্ম্য ফুটে উঠবে যা তার বিস্তারের প্রতীক— নাম মহিমা, চরণতীর্থ, সাধন শক্তি, মানসপূজা, ঐশ্বর্যময়ী মা, বিশ্বরূপ মা, লীলাময়ী মা, ব্রহ্মময়ী মা, কালভয়হারিণী মা, অভেদরূপিণী মা, অন্তরবাসিনী মা, করুণারূপিণী মা প্রভৃতি। আর গ্রামোফোন রেকর্ডে খুবই বিখ্যাত ছিল নজরুলের শ্যামাসঙ্গীত— যেমন, 'আমায় হৃদয় রাঙা মাগো' 'আমার শ্যামা মায়ের কোলে চড়ে', 'আমার হাতে কালি মুখে কালি', 'আমি বেল পাতা জবা দেবো না মাকে', 'শ্যামা নামের ভেলায় চড়ে', 'শ্মশানে জাগিছে শ্যামা', 'কে বলে মোর মাকে কালো', 'বল মা শ্যামা বল'... প্রভৃতি আরও বহু সৃষ্টি। আবার আমরা যদি কাজী নজরুল ইসলামের শ্যামাসঙ্গীতের গায়ক/গায়িকাদের কথা নিয়ে আলোচনা করি যাদের রেকর্ড প্রকাশিত হয়েছিল, প্রথমেই খুঁজে পাব মৃণালকান্তি ঘোষ মহাশয়কে। এছাড়াও বিজনবালা ঘোষ, শৈল দেবী, কৃষ্ণচন্দ্র দে, দেবেন বিশ্বাস, জ্ঞান গোস্বামী, নীলমণি সিংহ, কে. মল্লিক, কৃষ্ণদাস ঘোষ, বীণা চৌধুরী, শৈলেন গাঙ্গুলী প্রভৃতি বিশিষ্টজনদের।

সম্প্রীতি, উদারতা, মানবতা ও মিলনাত্মক ভাবধারা নিয়ে নওয়াজিশ খান, আলি রজা, আকবর আলি, মীর্জা হুঁসেন আলি, মুন্সি বেলায়েত হোসেন, সৈয়দ জাফর খাঁ, হাছন রাজা চৌধুরী প্রমুখরা শ্যামাসঙ্গীতকে সমৃদ্ধ করেছেন। আর সবাইকে ছাপিয়ে গিয়ে আমাদের হৃদয়ের কবি কাজী নজরুল ইসলাম ছত্রে ছত্রে বিদ্রোহের বাণী সহ শ্যামাসঙ্গীতে আকুতি ও ভক্তিরসে নিমগ্ন করেছেন আপামর মানবতাকে। তাই আগামী দিনে কাজী নজরুল ইসলামের এই সত্তা বিশ্বমানবের মনন দুয়ারে ধ্বনিত হোক। মানবতা বুঝুক মা শুধু মা-ই। ধর্মের গণ্ডী এক বন্ধন মাত্র তা থেকে উদারতার শিক্ষা যেন আমরা গ্রহণ করি। তাই শুধু নজরুল জয়ন্তী পালনে সীমাবদ্ধ থাকলে হবে না কাজী নজরুল ইসলামের শ্যামাসঙ্গীতকে সর্বস্তরে প্রসারিত করার শপথ নিয়ে ধর্মান্ধতাবিরোধী বার্তা দেওয়ার সময় এসেছে।

ঋণ স্বীকার :

'শ্যামাসঙ্গীত সংগ্রহ'--- রামরেণু মুখোপাধ্যায় ও বিভিন্ন গুণীমানুষের আলোচনা।

পরম্পরা

নৃত্য-স্রষ্টা নটরাজ

অমিত ঘোষদস্তিদার

নটরাজ শিব তাণ্ডবনৃত্যের স্রষ্টা। শিব অঙ্গহার, রেচক, পিণ্ডি সৃষ্টি করে তণ্ডুকে তা শিক্ষা দেন এবং তণ্ডু সেই নৃত্য কণ্ঠসঙ্গীত এবং যন্ত্রসঙ্গীত সহকারে পরিবেশন করেন। ধীর ও রুদ্ররস-সহ উদ্ধত ভঙ্গীর এই নৃত্যই তাণ্ডবনৃত্য।

নটরাজের বিভিন্ন নৃত্য অনুসারে তাণ্ডব নৃত্যকে সাতটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে— সংহার, ত্রিপুর, কালিকা, সন্ধ্যা, গৌরী, উমা, আনন্দতাণ্ডব।

আঙ্গিকম্ ভুবনম্ যস্য বাচিকম্
সর্ববাঙ্ময়ম্।

আহার্য্যম্ চন্দ্রতারাদি ত্বং নমঃ
সাত্বিকম্ শিবম্।।

এই বিশ্বভুবন তাঁর অঙ্গ। তাঁর মুখনিঃসৃত ওঙ্কারধ্বনি সমগ্র জগতের শব্দসৃষ্টির মূল। চন্দ্র-তারা তাঁর অলঙ্কার। ত্রিকালজ্ঞ সাত্ত্বিক শিবকে জানাই প্রণাম।

নটরাজ সৃষ্টি এবং ধ্বংসের দেবতা। তিনি রজঃ গুণে সৃষ্টি করেন, সত্ত্বগুণে পালন করেন এবং তমঃ গুণে ধ্বংস করেন।

নটরাজ যোগীবেশে (ছদ্মবেশে ভক্তদের পরীক্ষার জন্য) দক্ষিণ ভারতের তিল্লাই নামক স্থানে তর্কযুদ্ধে ঋষিদের পরাজিত করেন। ক্রুদ্ধ ঋষিগণ যজ্ঞ শুরু করেন। যজ্ঞাগ্নি থেকে বাঘ বের হয়ে শিবকে আক্রমণ করে। শিব কনিষ্ঠ আঙুলের নখ দিয়ে বাঘের শরীর থেকে চামড়া খুলে নিজে পরিধান করেন। যজ্ঞ থেকে সাপ বের হয়ে এলে শিব তাকে গলার ভূষণ করে নেন। এরপর যজ্ঞাগ্নি থেকে বিকট আকার বামন দৈত্য বা বামনরূপী দৈত্য বের হলে শিব তাকে ঊর্ধ্বে নিক্ষেপ করেন এবং ভূমিতে পতিত হলে তাকে পদতলে রেখে আনন্দনৃত্য করেন।

পরবর্তীতে শিব ওই স্থানে আবির্ভূত হন। আজও তিনি চিদাম্বরমের বিখ্যাত নটরাজ মন্দিরে প্রতীকী অবস্থান করে আছেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর জাভাযাত্রীর চিঠিতে শিবের দুই রূপ বর্ণনা করেছেন। একভাগে শিব অনন্ত, সম্পূর্ণ, নিষ্ক্রিয়, প্রশান্ত। অন্যভাগে পরিবর্তন পরম্পরার তাণ্ডবলীলা যা কালীর রূপের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে।

মহাজাগতিক নৃত্যের স্রষ্টা নটরাজ-রূপের মধ্যে সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের আবর্ত দেখা যায়। অপস্মর নামক মায়াবী দৈত্যকে বিনাশ করে শিব জীবকুলরক্ষাকারী মূর্তি ধারণ করেছেন। তিনি হলেন সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার, তিরোভাব ও অনুগ্রহ— এই পঞ্চক্রিয়ার আধার। পঞ্চক্রিয়ার অধিদেবতা— ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, মহেশ্বর, সদাশিব।

নটরাজ মূর্তি চার হাত বিশিষ্ট। দক্ষিণ দিকে উপরের হাতে ডমরু— যা সৃষ্টির প্রতীক। ডমরুধ্বনির সঙ্গে মহাপ্রাণ পঞ্চভূতের যোগ আছে। বামদিকের উপরের হাতে প্রজ্বলিত অগ্নি ধ্বংসের প্রতীক। দক্ষিণ দিকের নীচের হাতে অভয় দান— পালনের প্রতীক। বামদিকের নীচের হাতে 'গজহস্তমুদ্রা'— যার অর্থ তাঁর চরণে আশ্রয় নিলে মুক্তিলাভ। এই হাত সর্ব বিঘ্ননাশের প্রতীক। পদতলে পদ্মপীঠে অপস্মর বামন দৈত্যকে তিনি দলিত করছেন, অর্থাৎ অজ্ঞানকে বিনাশ করে তিনি মুক্তি এবং শান্তির জ্ঞানালোক দান করছেন। পিছনের চক্রাকারে অগ্নিগোলক প্রাণশক্তির অর্থাৎ ওঙ্কারের (অধ্যাপক সিমার-এর মতে) প্রতীক। নৃত্যের ছন্দে উৎক্ষিপ্ত শিব ও তাঁর জটাজালে গঙ্গা-হিমালয়- গোমুখী শরণাশ্রিত। কপালে অর্ধচন্দ্র (বা অগ্নি) জ্ঞানের প্রতীক, মাথার সর্প প্রকৃতি ও প্রাণশক্তির পরিচায়ক। এক কর্ণে পুরুষ ভূষণ এবং অন্য কর্ণে নারীভূষণ প্রমাণ করে তিনিই একাধারে পুরুষ এবং প্রকৃতি।

তাণ্ডব নৃত্যের প্রকারভেদ— সংহার তাণ্ডব, ত্রিপুর তাণ্ডব, কালিকা তাণ্ডব, সান্ধ্য তাণ্ডব, গৌরী তাণ্ডব, উমা তাণ্ডব, আনন্দ তাণ্ডব, লাস্য, দ্রুতম্, অনুদ্রুতম, আডাউ... ইত্যাদি। নৃত্য ছাড়াও যাবতীয় ভারতীয় শিল্প, ভাস্কর্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে নটরাজ শিব অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

নমস্তুভ্যং বিরুপাক্ষ নমস্তে দিব্যচক্ষুষে।
নমঃ পিণাক হস্তায় বজ্রহস্তায় বৈ নমঃ।।
নমস্ত্রিশূলহস্তায় দণ্ডপাশাংসিপাণয়ে।
নমস্ত্রৈলোক্যনাথায় ভূতানাং পতয়ে
নমঃ।।
শিবায় শান্তায়কারণত্রয়হেতবে।
নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বংগতি পরমেশ্বর।।
নমস্তে ত্বং মহাদেব লোকানাং
গুরুমীশ্বরম্।
পুংসামপূর্ণকামানাং কামপুরামরাঙ্ঘ্রিপম্।।
নমঃ শিবায়। নমঃ শিবায়। শিবায় নমঃ।।

ভারতীয় নৃত্যে নটরাজ শিবকে নৃত্যের স্রষ্টা বলা হয়েছে। তাঁর নৃত্যের ভিতর দিয়েই বিশ্বব্যাপী সৃষ্টিচক্রের রূপ প্রত্যক্ষ করা হয়েছে। ❙

কেশবের পরিকল্পনা

ভারতে তখন ইংরেজ শাসন চলছিল। ইংরেজরা দেশের বড় বড় শহরে তাদের ঘাঁটি তৈরি করেছে। মহারাষ্ট্রের নাগপুরে শহরেও ইংরেজদের এরকম দুর্গ ছিল। সেই দুর্গের মাথায় সবসময় উড়তো ইংরেজদের ইউনিয়ন জ্যাক পতাকা।

সেই শহরের এক বালক, নাম কেশব। কেশবের মা-বাবা দুজনই প্লেগ রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। সে কাকার

কাছে থাকে। বালক হলেও কেশব খুব বুদ্ধিমান। এই কম বয়সেই সে মলখম্বের ব্যায়াম করতে পারতো। পড়াশুনাতেও ভাল। শিবাজীর ইতিহাস পড়তে খুব ভাল লাগতো তার।

সীতাবর্ডি দুর্গে ইংরেজদের পতাকা উড়তে দেখে কেশবের একদিন মনে হলো— আমাদের দেশে ইংরেজদের পতাকা কেন উড়ছে? এই রাজ্যের রাজা তো শিবাজী ছিলেন, এখানে শিবাজীর পতাকা ওড়া উচিত। শিবাজীর পতাকার রঙ গেরুয়া। তখন বন্ধুদের সে ডেকে এই কথা বলল। আমাদের দেশে আমাদের রাজার পতাকা উড়বে, বিদেশিদের পতাকা নয়। বন্ধুরা বলল— তাহলে কী করা যায়? কেশব বলল— আমরা ওই পতাকা নামিয়ে গেরুয়া পতাকা উড়িয়ে দেব।

কিন্তু তা কীভাবে? ইংরেজরা যদি ধরে ফেলে তাহলে তো মেরে ফেলবে।

সবাই মিলে উপায় খুঁজতে লাগলো। কেশবের মাথায় তখন একটা বুদ্ধি এলো। সে বলল— আমরা মাটির নীচ দিয়ে সুড়ঙ্গ কেটে সেই পাহাড় পর্যন্ত যাব, তারপর সুযোগ বুঝে ইংরেজদের পতাকা নামিয়ে গেরুয়া পতাকা লাগিয়ে দেব। কেশবের কথা শুনে সবাই সায় দিল।

কয়েকদিন ধরে তারা একটা জায়গা খুঁজছে কোথায় সেই সুড়ঙ্গ খোঁড়ার কাজ শুরু করা যায়। তখন এক বন্ধু এসে খবর দিল তাদের পাঠশালার গুরুমশায় কদিনের জন্য বাইরে যাচ্ছেন। আমরা তাঁর বাড়িতে ঘরের মেঝেতে সুড়ঙ্গ খুঁড়তে পারি।

যেমন কথা তেমন কাজ। গুরুমশায় একা মানুষ, পরিবার পরিজন নেই। বাড়ি ফাঁকা। কেশবরা ঘরের মেঝেতে খুঁড়তে শুরু করলো। প্রতিদিন একটু একটু করে খোঁড়া হয়।

কয়েকদিন বাদে গুরুমশায় বাড়ি ফিরলেন। তিনি দরজা খুলে ঘরে ঢুকেই দেখেন মেঝেতে বড় গর্ত। চারদিকে মাটি ছড়িয়ে রয়েছে। গুরুমশায়কে দেখে সবাই দৌড়ে পালাতে লাগলো। কেবল একটি ছেলে দাঁড়িয়ে থকোলা, তার নাম কেশব।

গুরুমশায় কেশবকে জিজ্ঞেস করলেন— তোমরা মাটি খুঁড়ছিলে কেন?

কেশব উত্তর দিল— আমরা সুড়ঙ্গ তৈরি করে ওই ইংরেজদের পতাকা নামিয়ে গেরুয়া পতাকা ওড়াবো। কেশবের কথা শুনে গুরুমশায়ের চোখে জলা এলো। তিনি কেশবকে আশীর্বাদ করে বললেন— তুমি অনেক বড় দেশভক্ত হবে।

পরবর্তীকালে বড় হয়ে এই কেশব রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করেছিল।

(সংকলিত)

রাজ্য পরিচিতি

ত্রিপুরা

পূর্বোত্তর ভারতের রাজ্যগুলির মধ্যে ত্রিপুরা অন্যতম। এই রাজ্যে কখনো কোনো বিদেশি আক্রমণকারী আধিপত্য বিস্তার করতে পারেনি। রাজ্যের আয়তন ১০ হাজার ৪৯২ বর্গকিলোমিটার। জনসংখ্যা ৩৬ লক্ষ ৭১ হাজার ৩২ জন। রাজধানী আগরতলা। জেলা ৪টি। ভাষা বাংলা, কাকবোরক, ত্রিপুরী। সাক্ষরতা ৮৭.৭৫ শতাংশ। প্রধান ফসল ধান, গম, আখ, আলু, পাট। চা এখানকার সবচেয়ে বড় শিল্প। এছাড়া চটকল, অ্যালুমিনিয়ামের বাসন, কাঠের মিল, লোহার ফার্নিচার, চালকল, প্লাইউড ও তেলমিল রয়েছে। হস্তচালিত তাঁতশিল্প ত্রিপুরার প্রধান কুটিরশিল্প। নীরমহল, সেফিজল, ডম্বুরঝিল, কমল সাগর, জম্পুই পাহাড়, উনাকোটি, রাধাকিশোরপুর শক্তিপীঠ দর্শনীয় স্থান।

এসো সংস্কৃত শিখি

সুপ্রভাতম্।	সুপ্রভাত।
শুভরাত্রি:।	শুভরাত্রি।
ধন্যবাদ:।	ধন্যবাদ।
স্বাগতম্।	স্বাগত।
ক্ষম্যতাম্।	ক্ষমা করুন
কৃপয়া।	দয়া করে।
পুন: মিলাম:।	আবার দেখা হবে।
অস্তু।	আচ্ছা/ ঠিক আছে।

ভালো কথা

পাড়ার কুকুর

আমাদের পাড়ায় অনেক কুকুর আছে। ওরা সবসময় রাস্তাতেই থাকে। লোকে যা খাবার দেয় তাই খায়। কাউকে কামড়ায় না, কারো কোনো ক্ষতি করে না। আমি আর আমার দাদা রোজ রাতে ওদেরকে বিস্কুট খাইয়ে আসি। রাস্তার মোড়ে গিয়ে ডাকলেই সবক'টি দৌড়ে চলে আসে। একদিন আমরা খেয়াল করলাম যে একটা কুকুর নেই। দাদা বারবার করে ডাকলো, তবু এলো না। তখন আমরা হাতে বিস্কুট নিয়ে খুঁজতে বেরোলাম। খুঁজতে খুঁজতে গিয়ে দেখি কুকুরটি একটি চায়ের দোকানের পাশে শুয়ে আছে। গায়ে ঘা হয়ে গেছে। মাছি পড়ছে তাতে। দাদা বলল— কোনো দুষ্টুলোক অ্যাসিড ঢেলে দিয়েছে ওর গায়ে। পরের দিন আমরা ওষুধ এনে কুকুরটির গায়ে লাগিয়ে দেই। কুকুরটি এখন ভালো আছে।

সৌতিক মল্লিক, দশম শ্রেণী, কলকাতা-০৬।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

ছোটদের কলমে

মা

পবন দাস, দ্বাদশ শ্রেণী, চণ্ডীপুর, হাওড়া

গাছের পাতা সবুজ সবুজ,
সূর্যের আলো নাই।
মায়ের মুখের মিষ্টি হাসি
দেখতে আমি চাই।
তাই তো লাগে ভয়
ওই হাসিটি কেউ না
যেন চুরি করে লয়।
যদি কেউ চুরি করে
বলব আমি তাহে
ওই হাসিটি শুধুই আমার
অন্য কারো নহে।

এই বিভাগে ছোটরা কবিতা লিখে পাঠাও

পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : 8420240584
E-mail : swastika5915@gmail.com

মেল করা যেতে পারে।

আধুনিকা নারীদের হাতে কি পরিবার আদৌ সুরক্ষিত?

রিনি রায়

আধুনিকা ভারতীয় নারীরা কি আদৌ তাদের পরিবারকে সুরক্ষিত রাখছেন? নারীই তো পরিবারের ধারক। নারীর হাতেই তো পরিবারের সকলের সুখ-দুঃখ, ভালো-মন্দ, শরীর-স্বাস্থ্য সবকিছু নির্ভর করে। তবুও এমন উদ্ভট প্রশ্ন কেন?

বর্তমানের এই কর্মব্যস্ত সময়ে সকলের হাতে সময় কম? বিশেষত নারী যদি চাকুরিরতা হন, তবে তো কোনোও কথাই নেই। সংসার, সন্তান, কর্মক্ষেত্র সামলে সময় বের করা— নৈব নৈব চ। তবুও আগে যখন নারীর জগৎ সংসারের গণ্ডীর মধ্যে সীমিত ছিল, তখন তাদের অবসর ছিল প্রচুর। তাই অবসর সময়গুলোতে বিভিন্ন কাজের পাশাপাশি চলতো রান্না নিয়ে 'এক্সপেরিমেন্ট'। ঋতুভেদে জলখাবারে তাঁরা নিয়ে আসতেন বৈচিত্র্যের স্বাদ। আর সেগুলিতে যেমন থাকতো স্বাদ, তেমনি থাকতো পুষ্টিগুণ। যেমন গ্রীষ্মের প্রখর দাবদাহে শরীর ঠাণ্ডা রাখার জন্য বাড়ির মা, জেঠিমা, ঠাকুমারা বানাতেন আমপানা, বিভিন্ন প্রকারের চাটনি, আচার, আমসত্ত্ব, কাসুন্দি ইত্যাদি। গরমের মরশুমে আম তখনও ছিল, এখনও আছে। সেই আম বিভিন্নভাবে প্রক্রিয়াকরণ করে ব্যবহার করার কৌশল তাঁরা জানতেন। তাই একদিকে সেইসময় টাটকা ফল হিসাবে যেমন আমের ব্যবহার আমরা দেখতে পাই। তেমনি পরবর্তী মাসগুলোয় যাতে আমের স্বাদ বাড়ি বা পাড়া প্রতিবেশীরা পেতে পারে তারও ব্যবস্থা করতেন। এইভাবে মরশুমি ফল, সবজি সবকিছুকেই সেই সময়ে এবং অন্য সময়ে ব্যবহার উপযোগী করার একটা রেওয়াজ ছিল। এতে মরশুম এবং তার পরেও ওই সমস্ত ফল, সবজি মানুষ ব্যবহার করতে পারতো। আবার শীতকালে বিভিন্ন রকমের পুলি-পিঠে, পায়েস ইত্যাদিও মানুষকে রসনার তৃপ্তি দিত কিন্তু তাতে থাকতো না দীর্ঘকালীন কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার চোখ-রাঙানি। ভারতীয় খাদ্যাভ্যাস বা খাদ্যরুচি বিশ্বের পুষ্টিবিজ্ঞানীদের আলোচনার বিষয়। তাঁরা দেখিয়েছেন এই খাদ্যাভ্যাস মানুষকে সুস্থ সক্ষম রাখতে সাহায্য করে। শুধু তাই নয়, তাঁরা আরো জানিয়েছেন এই খাদ্যাভাস

আজকের বিশ্বে মেদ বৃদ্ধির মোকাবিলা করতে সক্ষম।

কিন্তু এখনকার আধুনিক নারীর ভরসা নুডলস্, বাজারে চলতি স্যুপ, কে এফ সি, ম্যাকডোনাল্ড, ডোমিনজ-এর পিৎজা, পাস্তা, বার্গার, পাড়ায় পাড়ায় গজিয়ে ওঠা রোল-চাউমিন, রুটির দোকান, হাজিগাজির বিরিয়ানি, চিকেন চাপ, মটনচাপ— এ তালিকা শেষ হওয়ার নয়। সময়ের সবিশেষ অনুমতি যেহেতু নেই, তাই রান্নাঘরে হয়তো কোনোমতে ভাত, ডাল বা মাছ রেঁধেই অফিস অথবা সন্তানের স্কুলে ছুটতে হয়। আর কোনোদিন যদি সময় না থাকে, তবে হোম ডেলিভারি। বাড়ন্ত বাচ্চাদের মুখের রুচি অনুযায়ী রাঁধা সম্ভব নয়। তাই বড় ভরসা দু' মিনিটের নুডলস্ বা বাজার চলতি হেল্‌থ ড্রিঙ্ক। আর এসব করেই স্বাস্থ্যের দফারফা। এরপর গোদের উপর বিষফোঁড়ার মতো গৃহিণীদের জন্য বিজ্ঞানের নতুন অবদান 'মাইক্রোওয়েভ ওভেন।' গ্যাসের সামনে দাঁড়িয়ে রান্না করার সময় যদি একান্তই না থাকে তখন শরণাপন্ন হতে হয় মাইক্রোওভেনের। কিন্তু এতে সময় হয়তো বাঁচে কিন্তু শরীর কি বাঁচে? নিজের অজান্তেই নারী তার পরিবারের প্রিয়জনদের কাছে বয়ে নিয়ে আসে ভবিষ্যতের দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতার বীজ। মাইক্রোওয়েভের ক্ষতিকারক বৈদ্যুতিক ও চৌম্বকীয় তরঙ্গ ভিটামিন, পুষ্টি নষ্ট করার পাশাপাশি খাদ্যে ক্যান্সার সৃষ্টিকারক উপাদান তৈরি করে, হৃদস্পন্দন পরিবর্তন করার সঙ্গে সঙ্গে শরীরের রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতাও কমিয়ে দেয়। আজ যদি আমরা আমাদের চারপাশের মানুষগুলোর দিকে তাকাই তবে দেখবো বাচ্চা থেকে বুড়ো সবাই কিছু না কিছু শারীরিক অসুস্থতায় ভুগছে। এমনকী একদম ছোট বাচ্চাদের মধ্যেও মেদ বৃদ্ধি, ডায়াবেটিস, হাইপ্রেশার, ক্যান্সার, চোখের জটিলতার মতো অসুখও দেখা দিচ্ছে।

এছাড়া আজকের সংসারের অত্যাবশ্যক অঙ্গ ফ্রিজও এই তালিকার বাইরে নেই। সময় ও পরিশ্রম বাঁচানোর তাগিদে বাড়ির মেয়ে-বউরা কাঁচা শাক-সবজি, মাছ, মাংস থেকে শুরু করে রান্না করা খাবার— সবই রাখে ফ্রিজে। ফল যা হবার তাই, পুষ্টিগুণ নষ্ট। উপরি পাওনা কিছু রোগ।

অথচ একটু সচেতন হলেই কিন্তু এই সকল সমস্যার আংশিক সুরাহা হতে পারে। যেহেতু পরিবারের দায়িত্ব আধুনিক কালেও নারীর উপরেই বর্তায়, তাই স্বাস্থ্যের প্রতি যত্ন রেখে নারীকে অত্যাধুনিক রান্নার সরঞ্জাম ব্যবহারে লাগাম পরাতে হবে। অতীতের রন্ধনপ্রণালীতে যে পুষ্টিগুণ বজায় থাকত, তা আজকের যুগে পাওয়া যাবে না ঠিকই। তবুও সময় বাঁচানোর জন্য, পরিশ্রম কম করার তাগিদে বাজার চলতি প্রক্রিয়াজাত খাদ্য, হোটেল-রেস্তরাঁর খাবার যতটা সম্ভব পরিবারের সদস্যদের না দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে। তবেই আমাদের চারপাশে অসুস্থতার প্রকোপ ক্রমশ কমবে। আর সমাজ এবং দেশ পাবে সুস্থ সবল জনসম্পদ যার উপর ভিত্তি করে দেশ আরোও এগোবে।

দেশের প্রচলিত আইনগুলিকে সময়োপযোগী করতে বেশ কিছু কাটছাঁট দরকার

অতিথি কলম

বসুন্ধরা রাজে

দেশের নানান আদালতে লক্ষ লক্ষ মামলা নিষ্পত্তির আশায় অপেক্ষমান। বহু আদালতে বিচারকের আকাল। এই অবস্থায় দেশের মধ্যে বহু মান্ধাতা আমলের আইনে তুচ্ছাতিতুচ্ছ অছিলায় অজস্র মামলা নিত্য দায়ের হচ্ছে। এই অবস্থা থেকে কিছু পরিবর্তন আনতে ২০১৫ সালে আমাদের সরকার লাগু থাকা ৫৯২টি আইনের যুগোপযোগিতা, একটি আইনের সঙ্গে আরও একটি প্রায় একই চরিত্রগত মিল থাকা আইনের অপ্রয়োজনীয়তা ইত্যাদির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ শুরু করে। এর ফলে ওই ৫৯২টি আইনের সংখ্যা ২০১৬ সালের শেষ নাগাদ ২৭৯-এ নেমে আসবে। আমাদের প্রক্রিয়াটিকে চার ভাগে ভাগ করে নেওয়া হয়েছিল— (১) বাতিল করা, (২) অনেকগুলিকে মিশিয়ে সংহত করা, (৩) আইনটির প্রাসঙ্গিকতা, (৪) একবার আইনে পরিণত হয়ে গেলেই তাকে অন লাইন পোস্ট করে দেওয়া। বলা দরকার, রাজ্য গত বছরই বাতিল প্রক্রিয়া শেষ করে। বিগত মে মাসে সংহতি করণের কাজ শেষ হয়। গত মাস থেকে সেগুলি অনলাইন পড়া যাচ্ছে।

চটজলদি কিছু দান খয়রাতি ও কায়েমি স্বার্থ সিদ্ধির আবহে দীর্ঘকালীনভাবে নাগরিকদের কিছু উপকারে আসবে— একজন রাজনীতিক হিসেবে সেই quest অর্থাৎ অনুসন্ধান আমার খুব প্রয়োজনীয় মনে হোত।

আমরা মাত্র ১০০টি আইনকে বলবৎ রাখার লক্ষমাত্রা নিয়েছিলাম। একবারে প্রাথমিক স্তরে এমন একটা সিদ্ধান্ত কার্যকরী করার ক্ষেত্রে বাধা আসাটা প্রত্যাশিত ছিলই। বিশেষ করে প্রচলিত আইনগুলির প্রাসঙ্গিকতা বিচার করার ক্ষেত্রে বিধানসভা সদস্যদের একটা অংশের ও আমলাদের মধ্য থেকে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া আসায় কিছুটা দেরি অবশ্যই হয়েছে। তাই ১০০ আইনে নামিয়ে আনার লক্ষমাত্রা পূরণ এই মুহূর্তে না হলেও ১ বছরের মধ্যে ৫০ শতাংশ ছাঁটকাট করতে পারাটা যথেষ্ট শ্লাঘার বিষয়। একই সঙ্গে আইন প্রণেতাদের ক্ষেত্রেও এটি একটি সংকেত —সময়মতো আইনের কাটছাঁট না করলে তা নখের মতো বাড়তেই থাকে। নোবেল পুরস্কার পাওয়া এলি উইজেল একবার বলেছিলেন, "I love the word question becouse it has the word quest in it" —আমি এই কথাটি নিয়ে ভেবে দেখেছি। সত্যিই চটজলদি কিছু দান খয়রাতি ও কায়েমি স্বার্থ সিদ্ধির আবহে দীর্ঘকালীনভাবে নাগরিকদের কিছু উপকারে আসবে— একজন রাজনীতিক হিসেবে সেই quest অর্থাৎ অনুসন্ধান আমার খুব প্রয়োজনীয় মনে হোত।

আর এই বিন্দুতে এসেই নাগরিকদের সঙ্গে আইন প্রণেতাদের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে আইনের অপব্যবহারজনিত যে দীর্ঘলালিত অবিশ্বাস জমে আছে তার নিরসন জরুরি হয়ে দাঁড়ায়। মূল আইন কেমনভাবে রচিত হয়েছিল, পরবর্তীতে তার ব্যাখ্যাই বা ছিল কিরকম আবার বাস্তবে কী প্রচলিত রয়েছে বা আইনের কতটাই বা প্রয়োজনে প্রয়োগ করা হয়েছে (enforcement of law) —এক কথায় আইনের সংখ্যা কম হলে তার অনেক ভাল দিক রয়েছে। প্রথমত এর ফলে দুর্নীতি কমবে, কমবে স্বজনপোষণ আর তার ফলে যখন তখন ছুঁতো-নাতায় আইনগত ব্যাখ্যা নেবার দরকার হবে না। কালক্রমে এতে অনাবশ্যক মামলার সংখ্যা কমবে, মামলা ঝুলে থাকাও কমে আসবে। এই বিষয়টা নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসার আগে আমরা নিজেদের মধ্যে চুলচেরা বিতর্ক করেছি। প্রথা মেনে কি আমাদের এই মর্মে একটি ল' কমিশন গঠন করাই যুক্তিসঙ্গত হবে? কিন্তু দেশের এই সংক্রান্ত তিক্ত অতীত অভিজ্ঞতার কথা মাথায় রেখে, বিশেষ করে, এই ধরনের কমিশনের কাজের গতি ও অভিমুখ ঠিক রাখার ক্ষেত্রে ইতিবাচকতার অভাব আমাদের এ রাস্তা থেকে সরে আসাই সঠিক বলে মনে হয়েছিল। ফলে আমরা এটাও ঠিক করেছিলাম আমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা বিতর্কের মাধ্যমেই নতুন রাস্তা

বের করে আমাদের লক্ষ্য পূরণ করব।

আমাদের উদ্ভাবিত রাস্তা যে সময়োপযোগী তা পরীক্ষা করে দেখতে বাতিল হওয়ার পর বর্তমানে প্রচলিত যে ২৭১টি আইন আমাদের হাতে রইল সেইগুলির প্রয়োজনীয়তা, ব্যবহার ও ব্যাখ্যা জানতে আমরা নিয়ত রাজ্যের বিচার বিভাগের সঙ্গে তালমিল রেখে চলেছি। এই ধারাগুলিতে কতগুলি মামলা হচ্ছে আমরা তার তথ্যাদি তুলে ভবিষ্যতের জন্য বিশ্লেষণ করছি যাতে কাজে উন্নতি হয়।

এই প্রসঙ্গে ২০১৫ সালে রাজস্থান Law Repealing Bill আনার ক্ষেত্রে ৬৬টি সরকারি বিভাগ থেকে মতামত ও পরিসংখ্যান নিয়েছি। মিটিং হয়েছিল কম করে ১০০টি যার ফলে এক ঝটকায় ১৪৮টি আইন এক লপ্তে বাতিল হয়ে যায়। এর আগে রাজ্যের বিধানসভা শেষবার একটি আইন বাতিল করেছিল সেই ১৯৬২ সালে। গত বছরেই নানান আইনকে এক ছাতার তলায় এনে মিলিয়ে মিশিয়ে একটা সংহত চেহারা দেবার চেষ্টা শুধু হয়। কিন্তু এই প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত জটিল। শিক্ষা ও রাজস্ব বিভাগেই শুধু ৭০টি করে আইন রয়েছে। এই সংহতিকরণ প্রক্রিয়াকে আমরা ৯টি বিভাগে চিহ্নিত করেছি। সেখান থেকে খুব শিগগিরই ৭৯টি আইন মিলেমিশে মাত্র ১৪টি হয়ে বিধানসভায় পেশ হতে চলেছে।

মনে হয়, আজকের পৃথিবীতে পার্থিব বস্তুকে হাতছাড়া করা মানুষের পক্ষে কত শক্ত। যেখানে আমরা অপ্রয়োজনীয় আইনগুলির হাত থেকে নিস্তার পেতে সঠিক অর্থে তাকে ঝেড়ে ফেলাটাকে একটা চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছিলাম। এই প্রজেক্টে কাজ করতে গিয়ে কত না দারুণ গল্প জমা হয়েছে।

অনেক বিভাগকে দেখেছি তারা যে আইনবলে কাজ করে চলেছে দপ্তরে তার কোনো কপি পর্যন্ত নেই। আবার আমরা যখন যথেষ্ট কাঠখড় পুড়িয়ে লেখ্যাগার থেকে কপি উদ্ধার করে দিলাম তখন তাঁরাই আবার আইনটিকে বাঁচিয়ে রাখতে উঠে পড়ে লাগলেন। আবার এমনও হয়েছে যে আইন ৫০ বছরে কখনও প্রয়োগ হয়নি তাকে দপ্তরগুলি টিকিয়ে রাখতে বদ্ধপরিকর। আইন বাতিল করার প্রকল্পকে যেন তেন প্রকারেণ আটকানোর জন্যই যে এগুলি করা তা বোঝা যায়। আইন কমে গেলে অদূর ভবিষ্যতে দপ্তরের কর্মী সংখ্যা কমে যেতে পারে— এমন একটা আশঙ্কাও তো কাজ করবে! তবু শেষ অবধি সব-বাধা আমরা মিলেমিশে কাটিয়ে উঠি।

কিন্তু আইনের অনাবশ্যক সংখ্যা কমিয়ে যাকে বলে কমপেক্ট করে দেওয়া যে কত জরুরি তার একটা উদাহরণ দেব। রাজস্থান জেল আইন ১৮৯৪, রাজস্থান আইডেন্টিফিকেশান অফ প্রিসোনারস অ্যাক্ট ১৯৫৬ ও রাজস্থান প্রিশোনারস অ্যাক্ট ১৯৬০ এই তিনটি আইন আলাদাভাবে পড়লে দেখা যায় সবগুলিই প্রায় একই কথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলছে। কেউই নতুন কিছু বলছে না। ঠিক তেমনই দেখা গেল Rajasthan State Cattle faris Act of 1963 আর রাজস্থান গোশালা আইন ১৯৬০ দু'টিরই গোত্র এক। এখানেই সংহতিকরণের প্রয়োজনীয়তা। এমন উদাহরণ প্রচুর।

আক্ষেপের কথা, বহুদিন থেকে ঝুলে থাকা জমি সংক্রান্ত মামলার ফলে একই চরিত্রের Rajasthan land Reforms ও রাজস্থান জাগীর আইন ১৯৫৫-কে একীকরণ করা যায়নি। আমাদের পুলিশ বাহিনীরও একই সঙ্গে Habitnal offenders (1953), Goondas (1975) ও Anti-social activities (2006) শুধু নামেই তফাত। এত ধারা নিয়ে কাজ করার কোনো প্রয়োজন নেই। সরকার চালাতে Minimum Goverment আর maximum Governance-এর সঙ্গে এই প্রচেষ্টা সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় কি? এক সংবিধান বিশেষজ্ঞ বিদেশির একটি বই রয়েছে 'The Indian Constitution : Cornerstone of a nation (গ্রানভিল অস্টিন)। সেখানে তিনি বলেছেন, ভারতের সংবিধান দেশের আদর্শগুলি প্রতিষ্ঠা করার সঙ্গে সঙ্গে সেই আদর্শকে বাস্তবায়িত করতে যথাযথ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলিকেও তৈরি করে দিয়েছে। বিশেষ করে বইটিতে দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে সংবিধানের ভূমিকার পাশাপাশি সুশাসন জারি রাখার উপযুক্ত আইনের কার্যকারিতার ওপরও বিস্তারিত পর্যালোচনা রয়েছে। যাতে দেশ যে কোনো আপতকালীন ও অনঅভিপ্রেত পরিস্থিতি এড়িয়ে শান্তিতে চলতে পারে।

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের লগ্নে দেশ ছিল এক লণ্ডভণ্ড অবস্থায়। এত বড় বিশাল দেশ যথার্থই 'নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান'-এর সঙ্গে নানা ধর্মীয় অবস্থানের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে আছে নিঃসীম দারিদ্র্যও। এমন অবস্থায় একটি নবীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পক্ষে টিকে থাকাই ছিল সমস্যাসঙ্কুল। কিন্তু আমরা শুধু টিকেই থাকিনি ক্রমাগত এগিয়ে চলেছি। তবু মনে হয় এবার সময় এসেছে বিশাল এই রাজনৈতিক গণতন্ত্রের দেশে একইসঙ্গে সামাজিক ও অর্থনৈতিক গণতন্ত্রেরও দৃঢ় প্রতিষ্ঠার।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই সূত্রে ৭টি শব্দের একটি মন্ত্র আমাদের দিয়েছেন— (১) সেবা ভাব, (২) সন্তুলন বা ভারসাম্য, (৩) সংযম বা আত্মশৃঙ্খলা, (৪) সমন্বয়, (৫) ইতিবাচক ভাবনা, (৬) সমবেদনা এবং (৭) সংবাদ বা সংযোগ। রাজস্থানের প্রচলিত আইনগুলিকে প্রয়োজনীয় সংস্কার করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে সংযোগ, সর্বদা ইতিবাচক ভাবনা নিয়ে চলা, প্রত্যেক বিভাগের মধ্যে সমন্বয় রেখে কাজ করতে গিয়ে আমি ওই সাতটি মন্ত্রকে বেশ উপলব্ধি করেছি। নেতৃত্ব দিতে গিয়ে আমার যে চিরকালীন প্রত্যয় তা আরও ইস্পাত কঠিন হয়েছে এবং তা হলো ভারতে এমন কিছু ভুল ত্রুটি নেই যা ভারতবাসী নিজেই তার মনমতো করে নিজের পক্ষে যা মঙ্গলজনক তার সঙ্গে জুড়ে দিতে পারে না।

জাতীয়তাবাদী বাংলা
সংবাদ সাপ্তাহিক
স্বস্তিকা
পড়ুন ও পড়ান

প্রতিবাদী থেকে মুক্তমনা মানুষ আর কত খুন হবেন বাংলাদেশে?

বরুণ দাস

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে পাকসেনারা নির্বিচারে হত্যা করে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের। প্রথমে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে। পরে বেছে বেছে শুধু হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের। শিক্ষা-সংস্কৃতি জগতের প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যক্তিত্বদের নির্বিচারে নির্মমভাবে হত্যা করে পাকসেনারা। বাংলা ও বাঙালিদের সভ্য জগৎ থেকে অন্ধকার যুগে ফিরে যাওয়ার পথ তৈরি করে দেয় পশ্চিম পাকিস্তানের বর্বর শাসককুল!

স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে একাত্তরের সেই কালো অধ্যায় কি ফিরে এলো? এমন একটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন বার বার ঘুরে-ফিরে আসছে বাংলাদেশের প্রতিবাদী ও মুক্তমনা মানুষদের নির্বিচারে হত্যা দেখে। আন্তর্জাতিক মহলও বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন বাংলাদেশের নারকীয় ঘটনাবলি দেখে। 'ইসলাম অবমাননা'র দোহাই দিয়ে চলেছে নৃশংস হত্যাকাণ্ড।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কট্টর ইসলামিক জঙ্গিদের প্রাণনাশের হুমকিতে ইতিপূর্বে দেশত্যাগে বাধ্য করা হয়েছে তসলিমা নাসরিন, দাউদ হায়দার, সালাম আজাদদের মতো মুক্তমনা আরও অনেককে। সরকার বদল হলেও দেশে তাঁদের ফিরিয়ে আনার কোনো চেষ্টাই করেনি পরিবর্তিত বাংলাদেশ সরকার। মৌলবাদী, ধর্মান্ধ, গণতন্ত্রবিরোধী, সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে কোনো কড়া পদক্ষেপই নিতে পারেনি সরকার।

ফলে তাদের শক্তি বেড়েছে। বছর দুয়েক ধরে বাংলাদেশে লাগাতার সংখ্যালঘু

জঙ্গিহানায় নিহত জনৈক হিন্দু।

সম্প্রদায়ের মানুষ, মুক্তমনা ব্লগার ও শিক্ষাবিদ, প্রতিবাদী বুদ্ধিজীবীদের ওপর প্রাণঘাতী আক্রমণ চলছে। একের পর এক কট্টর ইসলামিক জঙ্গিদের হাতে নৃশংসভাবে খুন হয়েছেন রাজশাহি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, সমকামী পত্রিকার সম্পাদক ও তার বন্ধু, মুক্তমনা ব্লগার, প্রগতিশীল মনের সাংস্কৃতিক কর্মী, বিদেশি কূটনীতিক। সর্বশেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী গত ১ জুলাই এক হিন্দু সেবায়েত এবং একজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী জঙ্গিদের হাতে নৃশংসভাবে খুন হয়েছেন। হিন্দু সেবায়েতের নাম শ্যামানন্দ দাস। তিনি ঝিনাইদহের একটি মঠে পুজো করতেন।

কট্টর ইসলামিক জঙ্গিদের হাতে একের পর এক প্রাণ দিয়েছেন নির্বিরোধী হিন্দু মন্দিরের পুরোহিত, বৌদ্ধ মঠের অধ্যক্ষ, ধর্মান্তরিত চিকিৎসক, খৃষ্টান ব্যবসায়ী। কোনো ক্ষেত্রেই খুনিদের ধরা সম্ভব হয়নি। হয়নি কঠিন কোনো শাস্তির ব্যবস্থাও। ফলে তারা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বেপরোয়া ভাবে তাদের পরিকল্পিত নারকীয় হত্যাকাণ্ড অব্যাহত রাখতে পেরেছে। ভীতির সঞ্চার করেছে মানুষের মনে।

গত বছরের ফেব্রুয়ারি থেকে এখন পর্যন্ত কট্টর ইসলামিক জঙ্গিদের হাতে খুন হয়েছেন বাংলাদেশের অন্তত ৪১ জন ব্যক্তি। ঘটনা পরম্পরা এভাবে চললে এই লেখা প্রেসে যাওয়ার সময় হয়তো সংখ্যাটা আরও অনেক বেড়ে যাবে। কারণ খুনিদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ সরকারের কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের বলিষ্ঠ প্রমাণ এখনও সেভাবে পাননি সেদেশের ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের মানুষ।

মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে সোশাল মিডিয়ায় সরব হওয়ায় বাংলাদেশে খুন হয়েছেন মুক্তমনা ব্লগার-অধ্যাপক অভিজিৎ রায়, রাজশাহি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি

বিভাগের অধ্যাপক তথা বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব এ এফ এম রেজাউল করিম সিদ্দিকি-সহ অনন্তবিজয় দাস, ওয়াশিকুর রহমান, নিলয় নীল, নাজিমুদ্দিন সামাদ প্রমুখ আরও অনেক মুক্তমনা মানুষ।

গত জানুয়ারিতে ঝিনাইদহে ধর্মান্তরিত খৃষ্টান পেশায় হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক সমির আলিকে খুন করে জঙ্গিরা। ঠিক তার পরের মাসেই অর্থাৎ একুশে ফেব্রুয়ারি ভাষাদিবসে কট্টর জঙ্গিদের হাতে খুন হন পঞ্চগড় জেলার সন্তগৌড়ীয় মঠের প্রবীণ পুরোহিত যজ্ঞেশ্বর রায়। গলা কেটে খুন করা হয় তাঁকে। ইসলাম অবমাননার কোনো অভিযোগও ছিল না প্রবীণ পুরোহিত যজ্ঞেশ্বর রায়ের বিরুদ্ধে।

তারপর তাদের হাতে গত ৬ জুন খুন হন আরও এক হিন্দু পুরোহিত। ঢাকা থেকে ১৬১ কিলোমিটার দূরে ঝিনাইদহ জেলার নলডাঙা গ্রামে ঘটনাটি ঘটে। নলডাঙার করাতিপাড়ায় তাঁর বাড়ি। সকালের দিকে সাইকেলে চেপে বাড়ি থেকে দু' কিলোমিটার দূরে মন্দিরে যাওয়ার পথে মহিষডাঙার কাছে একটি নির্জন মাঠের মধ্যে আক্রান্ত হন তিনি।

সত্তর বছরের বৃদ্ধ আনন্দগোপাল গঙ্গোপাধ্যায়কে ঘিরে ধরে তিন দুষ্কৃতী। মোটর বাইকে চেপে এসে ওই বৃদ্ধ পুরোহিতের মাথায় প্রথমে বাঁশ দিয়ে আঘাত করে জঙ্গিরা। তারপর ধারালো অস্ত্র দিয়ে গলা কেটে বাইকে চেপে পালায়। বেশ কিছুক্ষণ পরে মাঠের পাশে কাজে ব্যস্ত কৃষকেরা তাঁর মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখে চেঁচিয়ে লোকজন জড়ো করে। পরে খুনের দায় স্বীকারও করে আই এস।

হিন্দু পুরোহিত, খৃষ্টান ব্যবসায়ী ও চিকিৎসকের পর পাবনায় নিহত হন এক আশ্রমিক। গত ১০ জুন পাবনার হেমায়েতপুরে অনুকূলচন্দ্র ঠাকুর সেবাশ্রমের ষাটোর্ধ সেবককে ভোরের দিকে গলা কেটে খুন করা হয়। এটিও ইসলামিক জঙ্গিদের কাজ বলে সন্দেহ পুলিশের। গোপালগঞ্জে বাড়ি হলেও বছর ৪০ ধরে পাবনার অনুকূলচন্দ্র ঠাকুর সেবাশ্রমে থেকে দেখাশোনা করতেন নিত্যরঞ্জন পাণ্ডে নামে ওই প্রবীণ ঋত্বিক।

উল্লেখ্য, আগের খুনগুলির মতো একই কায়দায় ঘাড়ে-গলায় কোপ মেরে নিত্যরঞ্জনবাবুকে খুন করে পালিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা। স্থানীয় পুলিশ ও গ্রামবাসীদের কথায়, অত্যন্ত শান্ত ও নির্বিরোধী স্বভাবের মানুষ ছিলেন নিত্যরঞ্জনবাবু। এই হত্যাকাণ্ডে নিরাপত্তার অভাব বোধ করছেন নিহতের পরিবার-সহ আশ্রমের অন্যান্য সবাই। তারা প্রধানমন্ত্রীর কাছে এই হত্যার সুবিচার চেয়েছেন।

বলাবাহুল্য, অধিকাংশ খুনই হচ্ছে শহর কিংবা শহরতলির জনবহুল স্থানে এবং প্রকাশ্য দিনের আলোয়। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় হলো এই যে, এতো মানুষের সামনে নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হলেও হত্যাকারীরা কোথাও ন্যূনতম বাধার সম্মুখীন হচ্ছে না। আশপাশের কেউ এগিয়ে এসে দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে কোনো প্রতিরোধ গড়ে তুলছে না। ফলে খুনিরা সহজেই তাদের কাজ হাসিল করে নিরাপদে পালিয়ে যেতে সক্ষম হচ্ছে।

এ পর্যন্ত সব হত্যার দায়ই স্বীকার করেছে সেদেশের আইএস এবং আলকায়দা জঙ্গিগোষ্ঠীর সদস্যরা। কোনোরকম লুকিয়ে-চুরিয়ে কিংবা রাতের অন্ধকারে নয়, প্রকাশ্য দিবালোকে জনবহুল স্থানে জঙ্গিরা তাদের লক্ষ্যবস্তু অর্থাৎ শিকারকে নৃশংসভাবে হত্যা করে দিব্যি গা ঢাকা দিতে সক্ষম হয়েছে। টার্গেট পূরণ করে মিশে গেছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। কোথাও ব্যর্থ হয়নি তাদের লক্ষ্য! কিংবা ধরা পড়েনি তারা!

পরবর্তীকালে কোনো কোনো ক্ষেত্রে হয়তো-বা সন্দেহভাজন জঙ্গিদের দু-একজন ধরা পড়লেও কিংবা র‍্যাব বা পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে মারা গেলেও বাকি জঙ্গি বা অপরাধীরা থেকে গেছে নিরাপদ ও সক্রিয়। ফলে পরবর্তী হত্যাকাণ্ডের জন্য প্রস্তুতি নিয়েছে তারা। এবং প্রশাসনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে একই কায়দায় একের পর এক হত্যা অভিযান চালিয়ে নিজেদের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করে চলেছে।

বর্তমান বাংলাদেশ সরকারের পুলিশ ও প্রশাসন কট্টর ইসলামিক জঙ্গিদের বিরুদ্ধে এখনও পর্যন্ত তেমন কোনো কড়া পদক্ষেপ নিতে পারেনি একথা বলাই বাহুল্য। যদি পারতো তাহলে সেদেশে ধারাবাহিকভাবে এমন জঘন্য হত্যালীলা চলত না। নিঃসন্দেহে বর্তমান সরকারের প্রশাসনিক দুর্বলতাগুলো চিহ্নিত করে জঙ্গিরা তাদের কাজ হাসিল করতে সক্ষম হচ্ছে।

স্বরাষ্ট্র দপ্তরের জোরালো দাবি, বাংলাদেশে আইএস বা আলকায়দার কোনো অস্তিত্বই নেই। স্থানীয় জঙ্গিরাই এ সব হত্যার নেপথ্যে রয়েছে। আন্তর্জাতিক জঙ্গিগোষ্ঠীর সঙ্গে যোগাযোগের কথা বলে নিজেদের ওজন ও দর বাড়াতে চাইছে তারা। হতে পারে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক সঠিক কথাই বলেছে। বাংলাদেশে নিষিদ্ধ জঙ্গিগোষ্ঠী জামাতউল মুজাহিদিন বাংলাদেশ বা সংক্ষেপে জেএমবি'র কাজ এসব।

তবে এসব হত্যার পেছনে যে জঙ্গিগোষ্ঠীই থাক না কেন, প্রশাসন যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পুরোপুরি ব্যর্থ, তা বার বার প্রমাণিত হচ্ছে। আজ পর্যন্ত কোনও হত্যারই পুলিশের পক্ষে সুরাহা করা সম্ভব হয়নি। সামান্য ধরপাকড় হলেও হত্যার মূল চক্রীদের চিহ্নিত করে কঠোর শাস্তি দেওয়া যায়নি। ফলে হত্যাকারীদের কর্মকাণ্ড কিছুমাত্র থমকে যায়নি।

গত ৫ জুন বাংলাদেশে একই দিনে জঙ্গিগোষ্ঠীর হাতে খুন হন দু'জন। চট্টগ্রামের জিআইসি মোড়ে খুন হন সন্ত্রাসদমন শাখার পুলিশ অফিসার বাবুল আখতারের স্ত্রী মেহমুদা খানম এবং নাটোরে চার্চের খুব কাছেই নিজের মুদির দোকানে খৃষ্টান ব্যবসায়ী সুনীল গোমস। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদউজ্জামান খান কামাল জানিয়েছেন, এর পিছনে ধর্মীয় কট্টরপন্থীদের হাত আছে বলেই সন্দেহ করছে পুলিশ।

উল্লেখ্য, নিজের ছ'বছরের ছেলেকে স্কুলে পৌঁছে দিতে বাসস্টপে যাচ্ছিলেন

পুলিশ অফিসারের ত্রিশোর্ধ স্ত্রী মেহমুদা খানম। তখনই বাইকে করে এসে তিন দুষ্কৃতী নাবালক সন্তানের সামনেই তাকে ছুরি মেরে ও গুলি করে খুন করে। মৃত্যু নিশ্চিত করতে ছুরি মারার পর মেহমুদার মাথায় গুলি চালানো হয়। এরপর ব্যস্ত এলাকার মধ্য দিয়েই খুনিরা বাইকে চেপে নিশ্চিন্তে চলে যায়।

অন্যদিকে নাটোরের বনপাড়ার মিশনপল্লির চার্চের কাছে নিজের মুদির দোকানে দিনের আলোয় খুন হন বছর পঁয়ষট্টির খৃষ্টান বৃদ্ধ সুনীল গোমস। সন্ত্রাস-দমন শাখার পুলিশ অফিসারের স্ত্রী মেহমুদার হত্যার পিছনে সম্ভাব্য কারণ খুঁজে পেলেও নির্বিরোধী সংখ্যালঘু খৃষ্টান ব্যবসায়ী সুনীল গোমসের হত্যার পিছনে কী কারণ থাকতে পারে সে বিষয়ে পুলিশ ধন্দে পড়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বিএনপি'র শাসনকালেই ধর্মীয় কট্টরপন্থীরা বাংলাদেশে সক্রিয় হয়ে ওঠে। তৎকালীন বিএনপি'র প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার জোট সরকারের মন্ত্রীসভায় ছিলেন জামাতের কট্টরপন্থীরা। ফলে জামাতের জঙ্গিগোষ্ঠী প্রশাসনের ছত্রছায়ায় ডালপালা বিস্তারের সুযোগ পায়। তাদের আশ্রয়পুষ্ট জঙ্গিরাই আইএস বা আলকায়দার নামে অবাধ হত্যালীলা চালাচ্ছে।

পরে আওয়ামি লিগ ক্ষমতায় এলেও এদের বাড়বাড়ন্ত যে কিছুমাত্র কমানো সম্ভব হয়ে ওঠেনি একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। আওয়ামি লিগের সবাই যে ধর্মীয় বিষয়ে একশোভাগ লিবারেল— এমন কথা জোর দিয়ে বলা যায় কি! নাহলে টানা দু' বছর ধরে কোনো জঙ্গিগোষ্ঠী এমন নৃশংস হত্যালীলা চালিয়ে যেতে পারে? কট্টরপন্থীদের বিরুদ্ধে কী পদক্ষেপ করছেন সেদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক?

বরং কট্টরপন্থীদেরই পক্ষে যায় এমন নরম পাকের বিবৃতি দিয়েছেন হাসিনা সরকারের পুলিশ প্রশাসনের বড়োকর্তারা। কী সেই বিবৃতি? 'ধর্মীয় আবেগে আঘাত করাটা কারও পক্ষেই অনুচিত।' এ যাবৎ কট্টরপন্থীদের হাতে যে সমস্ত সংখ্যালঘু প্রাণ দিয়েছেন, তাঁদের কেউ সেদেশের সংখ্যাগুরু ধর্মীয় বিষয়ে অবাঞ্ছিত আঘাত হানেননি। ইসলাম কিংবা কোরান নিয়েও বিরূপ কোনো মন্তব্য করেননি।

তাহলে ওই ধরনের 'পুলিশি মন্তব্যের' মানে কী দাঁড়ায়? অকারণে জঙ্গিদের প্রতি পুলিশ ও প্রশাসনের নরম মনোভাব পোষণের কারণ কি? সেদেশের প্রধানমন্ত্রী মুখে 'কড়া কথা' বললেও কেন ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও মুক্তমনা মানুষের নৃশংস ও নারকীয় হত্যা নিয়ে ইসলামিক জঙ্গিদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিচ্ছেন না? তিনি এ বিষয়ে কোনো সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন বলে জানা নেই।

সরকারের দিক থেকে সঠিক কোনো উত্তর নেই। আসলে ধর্মীয় কট্টরপন্থীদের প্রতি সেদেশের সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়েরও প্রচ্ছন্ন মদত কিংবা সমর্থন আছে নিঃসন্দেহে। আর আছে বলেই বহু-চর্চিত শাহবাগ আন্দোলনও সেদেশে বেশিদিন ধরে রাখা সম্ভব হয় না। এই কঠিন বাস্তবকে অস্বীকার করা যায় কি? অকারণে 'ইসলাম বিপন্ন' আওয়াজ তুললে তাতে সাড়া দেওয়াটা কি ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের পবিত্র কর্তব্য?

দেশ জুড়ে এই হিংসা নিয়ন্ত্রণে সরকার কেন সেভাবে তৎপর নয়, দেশের গণ্ডি পেরিয়ে আন্তর্জাতিক মহলেও সে প্রশ্ন উঠেছে বারবারই। মার্কিন বিদেশ দপ্তরের সহকারি মুখপাত্র মার্ক টোয়েন স্পষ্টতই বলেছেন, বাংলাদেশ আর আগের মতো নিরাপদ দেশ নয়। কট্টর মৌলবাদীদের নিশানায় সেদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, বিদেশি কূটনীতিক ও মুক্তমনা মানুষ। খুনিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চায় আমেরিকা।

মার্কিন বিদেশ সচিব জন কেরিও কড়া ভাষায় নিন্দা করেছেন একের পর এক হত্যাকাণ্ডের। যদিও বাংলাদেশ সরকার খুনিদের বিরুদ্ধে যথার্থ পদক্ষেপ নিতে অপারগ। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক যাই বলুক না কেন, আইএস ও আলকায়দা জঙ্গিরা রীতিমত দাপিয়ে বেড়াচ্ছে বাংলাদেশে। তাদের লম্বা হাত প্রশাসনের কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত, তা খুঁজে দেখার সময় এসেছে। নাহলে বিপদ বাংলাদেশেরই অবশ্যম্ভাবী।

কিন্তু সে বিপদ এখনও আঁচ করতে পারছেন না শেখ হাসিনার সরকার। একথা সত্যি যে, তাঁর আমলে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের কূটনৈতিক সম্পর্কের অনেকটাই উন্নতি হয়েছে। ভারতবিরোধী কর্মকাণ্ডের নায়কদের তিনি সেদেশ ছাড়তে বাধ্য করেছেন কিংবা তুলে দিয়েছেন ভারতের হাতে। কিন্তু প্রকৃত সত্য হল, তিনি নিজের দেশে কট্টর ইসলামিক জঙ্গিদের বাগে আনতে পারেননি এখনও।

জেএমবি, আইএস বা আলকায়দা গোষ্ঠীর জঙ্গিরা সভ্য সমাজকে কোথায় নিয়ে যেতে চায়? ইসলামের নামে তারা যে নারকীয় হত্যাকাণ্ড শুরু করেছে, তাতে ইসলামের কতটা লাভ হচ্ছে? 'কোরান-ভিত্তিক দেশ গড়া'র নামে তারা সভ্য দুনিয়াকে মধ্যযুগের অন্ধকারে ফিরিয়ে নিতে আগ্রহী। সমাজের নিতান্ত নিরপরাধ ও নির্বিরোধী বিধর্মী মানুষদের হত্যা করে তারা কোন স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠা করবেন?

এদের হাত থেকে ছাড় পাচ্ছেন না স্বধর্মের শিক্ষিত, সচেতন ও প্রগতিশীল মননের মানুষও। 'ইসলাম অবমাননা'র অজুহাতে তাঁদেরও দেশছাড়া কিংবা নির্বিচারে হত্যা করে চলেছে মৌলবাদীরা। প্রগতি ও আধুনিকতা বিরোধী মানসিকতা নিয়ে তারা শেষপর্যন্ত কোথায় গিয়ে পৌঁছতে চান? ইসলাম কি আদৌ প্রগতিবিরোধী? আসলে কতিপয় ধর্মান্ধ মানুষের বিকৃত মানসিকতা ইসলামের পবিত্রতা নষ্ট করছে।

এদের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। ইসলাম যে 'শান্তির প্রতীক' (যদিও পবিত্র কোরানে ইসলাম শব্দটির মানে 'আত্মসমর্পণ') তা পৃথিবীর বুক থেকে মুছে দিতে বদ্ধপরিকর এরা। প্রকৃত ইসলামপন্থীদেরই এর বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধভাবে এগিয়ে আসতে হবে। নাহলে আমাগীদিনে ওইসব পৈশাচিক কর্মকাণ্ডে পবিত্র ইসলাম বিপন্ন হবে নিশ্চিত।

SURYA FOUNDATION

Tel. : 011-25262994, 25253681
Email : suryafnd@gmail.com Website : www.suryafoundation.net.in

सूर्या फाउण्डेशन युवाओं के समग्र विकास तथा प्रशिक्षण के लिए अब एक जानी-मानी संस्था बन चुकी है। इसका प्रमुख उद्देश्य है देश के प्रति निष्ठा रखते हुए अनेक तरह के उत्तरदायित्व निभाने के लिए तेजस्वी, लगनशील तथा धुन के पक्के नवयुवकों का निर्माण करना। **संघ संस्कारों** में पले-बढ़े, सामाजिक कार्यों में रुचि रखने वाले, शारीरिक रूप से सक्षम तरुणों के सूर्या फाउण्डेशन में प्रवेश हेतु निम्न categories में Cadres का इंटरव्यू होगा–

1. Engineers (IIT, NIT और Regional Engineering Colleges), CA, MBA (IT/Finance), MCA

आयु 20-23 वर्ष। वर्ष 2016 में Final year परीक्षा देने वाले भी आवेदन कर सकते हैं। सूर्या ट्रेनिंग सेंटर में 3 माह की प्रारंभिक ट्रेनिंग के पश्चात 1 वर्ष की On Job Training (OJT) / Practical & Campus Training (PCT) होगी जिसके बाद पोस्टिंग दी जायेगी। वेतन व stipend निम्न प्रकार होगा :

		Initial Training & OJT / PCT	After Training (CTC)
CA		50,000	As per performance
Engineer	B.Tech. (IIT)	50,000	- do -
	B.Tech. (NIT)	35,000	- do -
	B.Tech (REC)	20,000 - 25,000	- do -
MCA		20,000 - 25,000	- do -
MBA		15,000 - 25,000	- do -

2. Graduate Management Trainee (GMT)

योग्यता– 2016 में 10वीं या 11वीं या 12वीं की परीक्षा पास करने वाले भैया आवेदन कर सकते हैं। पिछली कक्षा में न्यूनतम अंक 60% तथा गणित में 75% अंक प्राप्त किए हों। **आयु :** 18 वर्ष से कम। सूर्या ट्रेनिंग सेंटर में 6 माह की प्रारंभिक ट्रेनिंग के बाद **OJT / PCT** में भेजा जायेगा। **OJT / PCT के साथ-साथ ग्रेजुएशन और MBA / MCA करने की सुविधा दी जायेगी।** प्रारंभिक 6 महीनों की ट्रेनिंग के दौरान भोजन और आवास की सुविधा फ्री रहेगी। साथ ही 3000/- प्रतिमाह स्कॉलरशिप मिलेगा। On Job Training के दौरान आवास तथा पढ़ाई के साथ-साथ **11वीं में 6000/-** और **12वीं में 7000/- Graduation 1st year में 9000/-, IInd Year में 10500/-, IIIrd Year में 12000/-, MBA/MCA 1st Year में 15000/-, MBA/MCA IInd Year में 20000/- Stipend** प्रतिमाह मिलेगा। **MBA/MCA पूरा होने के बाद 30000/- (CTC)** प्रतिमाह वेतन मिलेगा।

3. Assistant Staff Cadre (ASC)

योग्यता– 2016 में 10वीं या 11वीं या 12वीं की परीक्षा देने वाले भैया आवेदन कर सकते हैं। पिछली कक्षा में न्यूनतम अंक 55% एवं गणित में 60% अंक प्राप्त किए हों। **आयु :** 18 वर्ष से कम। सूर्या ट्रेनिंग सेंटर में 6 माह की प्रारंभिक ट्रेनिंग के बाद **OJT / PCT** में भेजा जायेगा। प्रारंभिक 6 महीने की ट्रेनिंग के दौरान 3000/- प्रतिमाह Stipend मिलेगा तथा फ्री भोजन और रहने की व्यवस्था होगी। **तीन वर्ष की OJT / PCT** के दौरान **Stipend - 1st year : 6000/-** प्रतिमाह व आवास, **IInd year : 7000/-** प्रतिमाह व आवास, **3rd year : 8000/-** प्रतिमाह व आवास। **After training 11000/- (CTC)** प्रतिमाह वेतन मिलेगा।

(आवेदन अलग कागज पर हिंदी या अंग्रेजी में ही भरकर भेजें)

Affix latest Photograph here

पूरा नाम ..... जन्मतिथि (अंको में) .....
पिता का नाम .....
पिता का व्यवसाय ..... मासिक आय .....
भाई कितने हैं (आप को छोड़कर) ..... बहनें कितनी हैं..... जाति .....वर्ग.....
विवाहित / अविवाहित .....
पढ़ाई का विवरण (Mark Sheet की फोटोकॉपी साथ जोड़ें) .....
पत्र व्यवहार का पता ..... पिन कोड ..... टेलीफोन नं॰ ..... Mobile No. :.....Email .....
NCC / NSS / OTC / ITC / शीत शिविर / PDC (कोई शिविर किया है तो उल्लेख करें) ..... शिविर में दायित्व
सेवा भारती / विद्या भारती / वनवासी कल्याण आश्रम के किसी विद्यालय / छात्रावास या संघ या परिषद अथवा विविध क्षेत्रों से संबंध रहा है तो कब और कैसे ..... दायित्व.....
सूर्या परिवार में कोई परिचित है तो! नाम एवं विभाग .....
सूर्या फाउण्डेशन के इंटरव्यू में पहले भाग ले चुके हैं तो वर्ष तथा कैडर का नाम .....

अपनी विशेष क्षमता, योग्यता, गुण एवं उपलब्धि अवश्य लिखें। इसके अतिरिक्त अपने विषय में कोई अन्य जानकारी देना चाहें तो अलग पेज पर लिखकर भेजें।

कृपया विस्तारपूर्वक बॉयोडाटा के साथ निम्न पते पर आवेदन करें। Category 1 के आवेदनकर्ता इसके अतिरिक्त अपना detailed CV भी साथ में भेजें।

सूर्या फाउण्डेशन : बी-3/330, पश्चिम विहार, नई दिल्ली-110063

विज्ञापन छपने के एक माह के अंदर आवेदन करें।

নব্বই বছরের যুবক রাজকুমার বৈশ্য

অন্য রকম

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ দীর্ঘায়ু যেমন সকলের কাম্য, তেমনই প্রত্যেক মানুষের জীবনে এমন এক সময় আসে, যখন দীর্ঘ আয়ু তার কাছেই অভিশাপ হয়ে দাঁড়ায়, বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু সম্প্রতি এমন এক নবতিপর বৃদ্ধের সন্ধান পাওয়া গেছে আমাদের প্রতিবেশী রাজ্য বিহারের রাজধানী পাটনায় যিনি কুড়ি থেকে নব্বই যেকোনো বয়সের মানুষের কাছেই রোল-মডেল হয়ে উঠতে পারেন। বয়সের ভার তাকে ন্যুব্জ করতে পারলেও, মনের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে মিইয়ে দিতে পারেনি। শতবর্ষের গোড়ায় এসে তাই এখনও তিনি স্বপ্ন দেখেন একজন অর্থনীতিবিদ হওয়ার। পরাধীন ভারতের মুক্তিকল্পে স্বাধীনতা সংগ্রামী, রাজকুমার বৈশ্যের অর্থনীতিবিদ হওয়ার ইচ্ছের নেপথ্যেও রয়েছে দেশপ্রেম। রাজকুমারবাবু সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, তার অর্থনীতি নিয়ে পড়াশুনা কেবলমাত্র ডিগ্রি পাওয়ার জন্য নয়, বরং বর্তমানে সাধারণ মানুষ, সমাজ, দেশ যে অর্থনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে, তা বুঝতে সচেষ্ট হওয়া। শুধু তাই নয়, তিনি আরোও জানতে চান যে দ্রব্যমূল্যের ক্রমবর্ধমান প্রবণতা থেকে কীভাবে সাধারণ মানুষকে স্বস্তি দেওয়া যায়, কেন দেশ দারিদ্র্য ও বেকারত্বের মতো গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ। অর্থনীতির হাল ফেরাতে তিনি যদি কিছু অবদানও রেখে যান, তাহলেও তার জন্ম সার্থক হবে। কেবল দেশ নয় বিদেশের অর্থনীতিতেও তিনি বেশ আগ্রহী। হঠাৎই চীনের মুদ্রার অবমূল্যায়নের কারণসমূহ জানতেও বেশ আগ্রহী রাজকুমারবাবু।

১৯৮০ সালে ঝাড়খণ্ডের কোডার্মার একটি প্রাইভেট ফার্মের জেনারেল ম্যানেজারের পদ থেকে ত্রিশ বছরের কর্মজীবন শেষে অবসর নেন। আট বছর আগে স্ত্রী গত হওয়ার পর বেরিলির বাসভবন ছেড়ে পাটনার রাজেন্দ্রনগর কলোনির অভিজাত এলাকায় পুত্র ও পুত্রবধূর ফ্ল্যাটে আসেন।

অতীতের স্মৃতি রোমন্থনে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন তিনি, এখনও তার স্মৃতিপট অমলিন। জীবনের প্রথম পরীক্ষা পাশের দিনক্ষণ, ১৯৩৮ বেরিলির গভর্নমেন্ট হাই স্কুলের থেকে ম্যাট্রিকুলেশন, তারপর ১৯৩৮-এ আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্র্যাজুয়েশন ও ১৯৪০-এ ব্যাচেলর অফ ল' কোর্সে ভর্তি হওয়া। সংসারের দায়িত্ব বাড়ায় এরপর আর পোস্টগ্র্যাজুয়েশন করা হয়নি। কিন্তু এবার তার সাধ পূরণ হতে চলেছে। ৯৬ বছর বয়সী রাজকুমারবাবু তাই নাম নথিভুক্ত করিয়েছেন নালন্দা ওপেন ইউনির্ভাসিটিতে। তাঁর বয়সী দেশের অন্য প্রান্তের প্রবীণরা যাতে মানসিকভাবে ভালো থাকতে পারেন, তাই তাদের প্রতি এক বার্তায় তিনি বলেছেন, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে যেকোনো শখের সঙ্গে জড়িয়ে নিতে। বয়স হওয়া মানেই যে সবকিছু শেষ, তা কিন্তু মনে করেন না তিনি। এই বয়সেও তাই নিয়মিত পড়েন বিভিন্ন বই, সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন। এমনকী জমিয়ে বসে টিভিতে ঐতিহাসিক ধারাবাহিকও দেখেন আত্মবিশ্বাসী, প্রাণোচ্ছল রাজকুমারবাবু চশমা ছাড়া এখনও পড়তে পারেন। তাঁর বয়সী মানুষরা যখন নিরাশার অন্ধকারে ডুবে পরপারে যাওয়ার অপেক্ষায় রত, তখন নতুন উদ্যমে তিনি অধ্যয়নে ব্যস্ত। হাসি হাসি মুখে তিনি বলেন, ''আমি খুশি যে আমার ছেলের বাড়িতে পড়াশুনার পরিবেশ রয়েছে। আমার ছেলে ও পুত্রবধূ আমায় স্ট্যাটিসটিকস্-এর ব্যাপারে সাহায্য করবে...'' ''সকালে দু'ঘণ্টা বিকালে দু'ঘণ্টা পড়ে আমি আমার সিলেবাস শেষ করবো।'' নবতিপর যুবকের এই উৎসাহে উচ্ছ্বসিত তাঁর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার এস পি সিনহা জানান, তাঁর বয়স উৎসাহের কথা মাথায় রেখে বিশ্ববিদ্যালয় তরফে একটি টিম তাঁর ছেলের বাড়িতে পাঠানো হবে।

এম এ পরীক্ষা দিচ্ছেন রাজকুমার বৈশ্য।

একসময় স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী এই নমস্য ব্যক্তি দেশ সেবার বিনিময়ে কখনও পেনশনও দাবি করেননি। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস, গান্ধীজী, নেহরুকে স্বচক্ষে দেখেছেন, নিজে কানে শুনেছেন তাদের অগ্নিভাষণ। অসংখ্য বীরের রক্তের বিনিময়ে প্রাপ্ত এই স্বাধীন দেশে দুর্নীতির রমরমা দেখে খুবই আঘাত পান তিনি। বলেন, ''ঘুষ ছাড়া তো অফিসগুলোতে কিছুই সরে না।'' তবে বর্তমানে মোদীর কাজ ও ভিশনে যথেষ্টই প্রভাবিত রাজকুমার বৈশ্য। দেশের যুবাদের উৎসাহিত করেন সততার সঙ্গে কঠোর পরিশ্রম করতে।

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ২০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

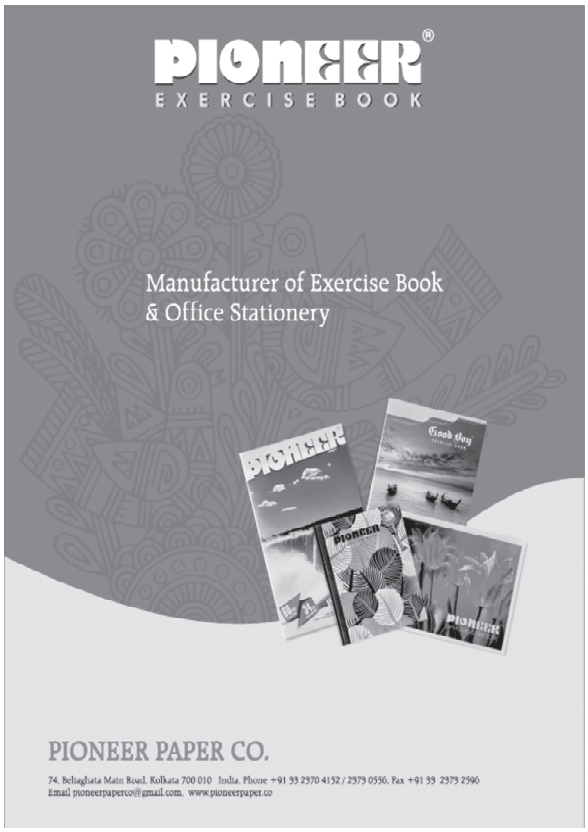

‘সেজন্য দেখা যায়, হিন্দু এবং মুসলমানগণের মতভেদ যতটা শুদ্ধীকরণ এবং গার্হস্থ্য ধর্মের খুঁটিনাটি নিয়ম নিয়ে, ততটা ধর্ম বা মতবাদ নিয়ে নয়। যত এই দুই ধর্মমতের উচ্চতর অবস্থায় পৌঁছানো যাবে, ততই এই বিশ্বাস দৃঢ়তর হবে। কারণ, যত পূর্ণরূপে এই দুই ধর্ম উপলব্ধি করা যায়, ততই দেখা যায়, একটি অপরটির মধ্যে পরিপূর্ণভাবে মিশে এক হয়ে গেছে।’

— ভগিনী নিবেদিতা

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

বড়বাজার লাইব্রেরির উদ্যোগে সাংবাদিক সভা

কলকাতার বড়বাজার লাইব্রেরির দ্বিমাসিক সাহিত্য সভায় গত ১৮ জুন লাইব্রেরি ভবনস্থিত আচার্য বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রী সভাগারে 'সংবাদের অভিমুখ' শীর্ষক এক সাংবাদিক সভার আয়োজন করা হয়। সভায় সাংবাদিকতার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন হিন্দী প্রভাতবার্তার পূর্বতন সম্পাদক রাজ মিঠৌলিয়া, ভারতচিত্র পত্রিকার সম্পাদক অশোক পাণ্ডে, যুবাশক্তির সম্পাদক সুধাংশু শেখর, ফার্স্ট নিউজ পত্রিকার সম্পাদক সঞ্জয় সনম, ভারত এক নজর পত্রিকার সম্পাদক মনোজ পাণ্ডে, পশ্চিমবঙ্গের প্রবীণ সাংবাদিক রথীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজস্থান পত্রিকার সম্পাদক রাজীব হর্ষ, সরস্বতী পত্রিকার সম্পাদক মহাবীর প্রসাদ দ্বিবেদী প্রমুখ। এছাড়াও আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন সত্যপ্রকাশ দুবে, সীতারাম আগরওয়াল, জীবন সিংহ ও বিষণ শিখওয়াল। সভায় সভাপতিত্ব করেন লখনউয়ের রাষ্ট্রধর্ম পত্রিকার সম্পাদক আনন্দ মিশ্র 'অভয়'। সভা পরিচালনা করেন ড. গিরিধারী রায়। কলকাতার বহু প্রবীণ ও নবীন সাংবাদিক সভায় উপস্থিত ছিলেন।

ক্রীড়াভারতীর উদ্যোগে কাঁথিতে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস

ক্রীড়াভারতীর উদ্যোগে কাঁথিতে যথাযোগ্য মর্যাদায় আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালন হয়। এদিন সকালে সূর্য নমস্কার ও প্রাণায়াম শিবিরের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন কাঁথি কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক গৌরহরি গিরি। স্বাগত ভাষণ রাখেন কাঁথি শাখার সম্পাদক ইন্দ্রনীল নন্দ। এছাড়াও আলোচনা করেন সংগঠনের শুভানুধ্যায়ী রঞ্জন জানা। ক্রীড়া ভারতী কাঁথি শাখার সহ সভাপতি তথা যোগাসনবিদ সুকুমার প্রধান জানান, গত পঁচিশ বছর ধরে তাঁরা কাঁথিতে যোগাসন চর্চা চালিয়ে যাচ্ছেন।

আনন্দের খবর, এবারে কাঁথি থেকে সংকল্প মাইতি, অনুপ্রভা দাস ও চন্দ্রশ্রী সাহু সারা ভারতে যোগাসনে চ্যাম্পিয়ান হয়েছে এবং আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহে আন্তর্জাতিক যোগ প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে ইতালি পাড়ি দেবে। এরপর তিনি ছাত্র-ছাত্রী অভিভাবক-অভিভাবকদের খালি হাতে ব্যায়াম মুদ্রা আসনের প্রশিক্ষণ দেন। সংস্থার পক্ষ থেকে এদিন তিন কৃতীকে পুষ্পস্তবক ও আর্থিকমূল্যে সম্মানিত করা হয়। কিশোরনগর যোগ শাখার পক্ষ থেকে ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের টিফিনের খরচ বাঁচিয়ে সেই টাকা ইতালি যাওয়ার জন্য এদের হাতে

তুলে দেয়। এই দিনটিকে মানুষের কাছে আরো বেশি করে পৌঁছে দিতে একটি সুসজ্জিত শোভাযাত্রা কাঁথি শহর পরিক্রমা করে। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সংস্থার জয়দীপ ঘোড়াই, সৌমেন দত্ত, গৌতম ঘোড়াই তরুণ কামিলা, সিদ্ধার্থ শাসমল প্রমুখ।

হাওড়ার তাজপুরে যোগদিবস

পতঞ্জলি যোগ সমিতি, হরিদ্বার পরিচালিত শ্যামাপ্রসাদ ইন্সটিটিউট অব্ কালচার, তাজপুর, হাওড়ার উদ্যোগে শ্যামাপ্রসাদ ইন্সটিটিউট হলে প্রসাদ স্মৃতি সরস্বতী শিশুমন্দিরের ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকমণ্ডলীর উপস্থিতিতে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষে সকাল ৭টায় একটি যোগ প্রাণায়াম শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে যোগ প্রাণায়াম প্রদর্শন ও প্রশিক্ষণ প্রদান করেন যোগ শিক্ষক তপন রীত ও স্বপন মান্না। শিশুমন্দির শিক্ষকমণ্ডলী ছাত্রদের যোগ অনুশীলনের জন্য সপ্তাহে স্থায়ী একটি কালাংশ নির্ধারণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

কাটোয়ায় কুটুম্ব প্রবোধনের সভা

গত ২৪ জুন পূর্বস্থলী থানার অন্তর্গত মাজিদা অঞ্চলের বরেয়া গ্রামে এবং ২৫ জুন শনিবার কালেখাঁতলা অঞ্চলের বিশ্বরম্ভা গ্রামে পর পর দুদিন কুটুম্ব প্রবোধনের সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিন ১৯ জন পুরুষ, ২০ জন মহিলা মোট ৩৯ জন এবং দ্বিতীয় দিন ১৭ জন পুরুষ, ২২ জন মহিলা মোট ৩৯ জন সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভায় দক্ষিণবঙ্গের কুটুম্ব প্রবোধন প্রমুখ অমর কৃষ্ণ ভদ্র উপস্থিত থেকে অত্যন্ত উৎসাহপূর্ণ পরিবেশে সাবলীল ভাষায় পরিবারের সুখ সমৃদ্ধির বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। দুই দিনেই সভা পরিচালনা করেন দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত টোলীর সদস্য বিনয়ভূষণ দাস।

ফঃ ৫

উত্তরবঙ্গ সংস্কার ভারতীর সাধারণ সভা ও শিল্পী সম্মেলন

উত্তরবঙ্গ সংস্কার ভারতীর সাধারণ সভা ও শিল্পী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় গত ২৫-২৬ জুন শিলিগুড়ি সরস্বতী শিশুমন্দিরে। সভায় উত্তরবঙ্গের সাংগঠনিক ১৩টি জেলার ১৭টি সমিতি থেকে ১৪২ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। সভা ও শিল্পী সম্মেলনের উদ্বোধন করেন আরোগ্য ভারতীর পূর্বক্ষেত্র প্রমুখ পূজ্যপাদ শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন শিলিগুড়ি সমিতির সভানেত্রী শ্রীমতী মণিকা সরকারের নেতৃত্বে সমিতির সদস্যবৃন্দ। বৈঠকে উপস্থিত থেকে পথনির্দেশ করেন প্রান্তীয় সভাপতি অধীর নীলকণ্ঠ রায়, প্রান্তের সাধারণ সম্পাদক বিকাশ ভৌমিক, সহ-সভাপতি সঞ্জয় নন্দী, কোষাধ্যক্ষ বিপ্লব দে, সম্পাদক নভেন্দু দত্ত, সহ-সঙ্গীত সংযোজক দিলীপ মল্লিক, কার্যকারিণীর সদস্য কালিম্পংয়ের বিক্রম পরাজলি, চাঁচলের লক্ষ্মণ পাণ্ডে প্রমুখ। অখিল ভারতীয় প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত ছিলেন পূর্বোত্তর ক্ষেত্র প্রমুখ ড. ধনঞ্জয় কুমার। সন্ধ্যায় শ্রীমতী সঞ্চারী সরকারের কত্থক নৃত্য, কোচবিহারের শিল্পীদের ভাওয়াইয়া গীত, রায়গঞ্জের শিল্পীদের বর্ষামঙ্গল, পরিবেশ সুরক্ষায় দার্জিলিংয়ের বিজনবাড়ির লোকনাটিকা এবং জিয়াগঞ্জের আকাশ কুমারের বেহালাবাদন পরিবেশিত হয়।

কলকাতায় বাংলার বিপ্লবী উত্তরাধিকার নিয়ে আলোচনা সভা

'বাংলায় বিপ্লবী ঐতিহ্যের স্মৃতি বর্তমানে ফিকে হয়ে আসছে?' গত ৪ জুন এই সম্পর্কে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় গোল পার্কের রামকৃষ্ণ মিশন ইন্সটিটিউট অফ কালচারে। কেন্দ্রীয় সরকারের মানব সম্পদ বিকাশ মন্ত্রকের অধীন ভারতীয় ইতিহাস গবেষণা পরিষদের (ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ হিস্টরিকাল রিসার্চ, সংক্ষেপে আই সি এইচ আর) অর্থানুকূল্যে একটি সময়োপযোগী আলোচনা সম্ভব হয়। দেশের অনেক শীর্ষস্থানীয় ঐতিহাসিক আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি চিত্ততোষ মুখোপাধ্যায় তাঁর প্রারম্ভিক ভাষণে আদালতে রক্ষিত বিভিন্ন বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের বিচার বিভাগীয় নথিপত্র জনসমক্ষে আনার ওপর জোর দেন।

আই সি এইচ আর সভাপতি ড. ওয়াই এস আর রাও জাতি ও রাজ্যের ধারণার তফাত করতে চান। পাশ্চাত্যের জাতি-রাষ্ট্রের ধারণা ভারতীয় ইতিহাসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। ভারতীয়রা এক জাতি, কিন্তু ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে ভারতে রাজ্যের পরিধির সংকোচন- সম্প্রসার ঘটেছে। এককালে তা আফগানিস্তান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় সংস্কৃতির অনেক কীর্তিচিহ্ন এখনও বিরাজ করছে। সাম্প্রতিক ইতিহাসের উদাহরণ দিয়ে ড. রাও বলেন, ১৯৪৭ সালে ১৫ আগস্টের পর দেশীয় রাজ্যগুলি একে একে ভারত রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়। তাদের অধিবাসীরা কি তবে তার আগে ভারতীয় ছিলেন না? ভারতীয় জাতির ইতিহাস তার বর্তমান পরিসরে সীমাবদ্ধ করে রাখা সম্ভব নয়।

ত্রিপুরার রাজ্যপাল অধ্যাপক তথাগত রায় তাঁর বক্তব্যে জাতীয় সংহতির ক্ষেত্রে সংখ্যালঘু তোষণ নীতির বিপদের কথা উল্লেখ করেন। মিডিয়া পর্যন্ত এই সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে নয়। অখিল ভারতীয় ইতিহাস সংকলন সমিতির পশ্চিমবঙ্গ শাখার সভাপতি ড. নিখিলেশ গুহ বলেন, আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে ধর্মীয় চেতনা ছিল বড় অনুপ্রেরণা। মার্কসবাদ এই ধর্মীয় চেতনাকে তাচ্ছিল্য করে। উপরন্তু ভারতীয় কমিউনিস্টরা দেশের প্রাতঃস্মরণীয় মনীষীদের প্রাপ্য সম্মান প্রদর্শনে বহু ক্ষেত্রেই কুণ্ঠিত। এর ক্ষতিকারক প্রভাব থেকে পশ্চিমবঙ্গের যুব সমাজকে মুক্ত করার দায়িত্ব আমাদের পালন করতে হবে। নেতাজী গবেষক ড. পূরবী রায় এবং ইন্সটিটিউট অফ হিস্টরিকাল স্টাডিজ-এর অধিকর্তা ড. চিত্তব্রত পালিত সভায় বক্তব্য রাখেন। সভায় স্বাগত ভাষণ দেন জাতীয় অধ্যাপক জয়ন্ত রায় অতিথিদের সংস্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন বিমল প্রামাণিক। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের পরিচয় করিয়ে দেন মোহিত রায়।

ঝাড়গ্রামে যোগদিবস উদ্‌যাপন

গত ২৬ জুন ক্রীড়া ভারতী ঝাড়গ্রাম জেলার উদ্যোগে আন্তর্জাতিক যোগদিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে আমন্ত্রণমূলক আন্তঃজেলা যোগাসন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন ক্রীড়া ভারতীর সারা বাংলার সহ-সভাপতি ও অলিম্পিয়ান (রাইফেল স্যুটার) ক্যাপটেন ভগীরথ সামুই। দক্ষিণবঙ্গের সহ-সম্পাদক রনজয় দাস। অনুষ্ঠানের সভাপতি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কুমুদকুমারী উচ্চতর বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অনুপ কুমার দে। প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে সকাল ১০.৩০ মি. থেকে কুমুদকুমারী উচ্চতর বিদ্যালয়ে বিকাল ৪টা পর্যন্ত অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়। নিবেদিতা গ্রামীণ কর্মমন্দিরের (মানিকপাড়া) বোনেদের গীতি প্রদর্শনী উপস্থিত শ্রোতাদের মুগ্ধ করে। প্রায় ৩৫০ জন অভিভাবকের উপস্থিতিতে মোট ১০৭ জন প্রতিযোগী প্রতিযোগিতাতে অংশগ্রহণ করেন।

শোকসংবাদ

পুরুলিয়া জেলার বাঘমুন্ডির ছাতাটাঁড় শাখার স্বয়ংসেবক তথা জেলা সম্পর্ক প্রমুখ সুশীল কুমারের মাতৃদেবী সুখদা কুমার গত ২২ জুন পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর।

তিনি ২ পুত্র, ৩ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

ব্যারাকপুরে পূর্ব সৈনিক সেবা পরিষদের সম্মেলন

গত ৮ জুন অখিল ভারতীয় পূর্ব সৈনিক সেবা পরিষদের পূর্ব সৈনিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ব্যারাকপুর ক্যান্টনমেন্টের সৈনিক প্রেক্ষাগৃহে। এই বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে উপচে পড়া ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। মঞ্চে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন (ABPSSP)-র সর্ব ভারতীয় সহ-সভাপতি এয়ার ভাইস মার্শাল এইচ পি সিং, ভি আর সি, ভি এস এম, (অব)। অন্যতম বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ব্যারাকপুর ক্যান্টমেন্টের এস এম, স্টেশন কমান্ডার বিগ্রেডিয়ার এইচ এস সন্ধু। ব্যারাকপুর বায়ু সেনা স্টেশনের স্টেশন কমান্ডার গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ ত্রিপাঠি। এছাড়া মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন নোয়াপাড়া বিধানসভার বিধায়ক মধুসূদন ঘোষ, বিগ্রেডিয়ার এন এস মুখার্জি, এস এম, ভি এস এম (অব), কর্নেল সব্যসাচী বাগচী (অব), লে: কর্নেল এস এন ঘোষ (অব) এবং ABPSSP-র রাষ্ট্রীয় সংগঠন সম্পাদক শ্রী বিজয় কুমার (অব)।

অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন পূর্ব সৈনিক সেবা পরিষদের (প.ব.) প্রেসিডেন্ট ব্রিগেডিয়ার অশিস কুমার দত্ত, ভি এস এম (অব)। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন এল টি কল এস বি দাস, (প.ব.) ব্যারাকপুর ইউনিট প্রেসিডেন্ট পিএসএসপি। Lcdr S. Chattopadhyay (Retd), President PSSP (W.B) Barasat unit, Sub Asim De (Retd), Gen Seey PSSP (W.B.) Sgt S. Karmakar (Retd) and Mr. Diponkar (Retd) Ghosh.

অনুষ্ঠানের বক্তরা রাষ্ট্রহিতে সমাজ সংগঠনের কাজে পূর্ব সৈনিকদের অগ্রণী ভূমিকা নেওয়ার আহ্বান জানান। দেশাত্ববোধক সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। বিভিন্ন জেলা থেকেও পূর্ব সৈনিকরা উপস্থিত ছিলেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি মিলনমেলার রূপ নেয়।

শোকসংবাদ

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার মুররীপুর শাখার স্বয়ংসেবক তথা বিশ্বহিন্দু পরিষদের জেলা সভাপতি নিখিল কুমার সরকারের মাতৃদেবী প্রমদা সরকার গত ৮ জুন পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর। তিনি ৪ পুত্র, ৪ পুত্রবধু ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

বাংলাদেশে হিন্দু হত্যার প্রতিবাদে খড়দায় হিন্দু জাগরণ মঞ্চের মিছিল শুরু হয় সকাল ১০ টায় কল্যাণ নগর বটতলা থেকে খড়দহ শ্যামসুন্দর মন্দির পর্যন্ত। উপস্থিত ছিলেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, অনুকুল সৎসঙ্গ আশ্রম এবং আরও বিভিন্ন আশ্রম এর সাধু সন্তেরা। মিছিলে পা মিলিয়েছেন খড়দহ এলাকার সাধারণ লোক জন।

গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালন

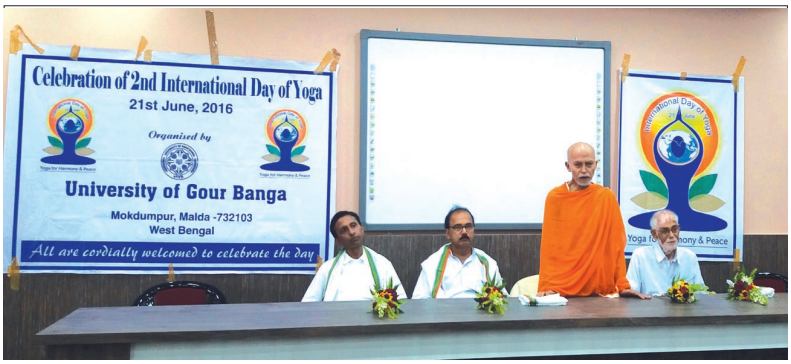

মালদহ গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে ২১ জুন দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় পরিসরে ক্যাম্পাসে সেদিন সকালে একশো ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে অধ্যাপকরা যোগাসনে অংশগ্রহণ করেন। বিকেলে যোগদিবসের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন গাঙ্গুরিয়া রামকৃষ্ণ মিশনের মহারাজ স্বামী গিরিজাত্মানন্দ মহারাজ, মালদহ পতঞ্জলি যোগপীঠের সুবীর ঝা এবং প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক ভক্তিভূষণ চৌধুরী। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন শিক্ষা বিভাগের অধ্যাপক ড. বাপি মিশ্র।

শোকসংবাদ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উত্তরবঙ্গ প্রান্তের সিকিম বিভাগ প্রচারক সন্দীপ সামন্তর দাদা জ্যোতিসিন্ধু সামন্ত গত ২৬ জুন বর্ধমান জেলার ভাতার থানার পলবোনা চটি গ্রামের বাড়িতে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৪৮ বছর। তিনি বাবা, মা, স্ত্রী, এক কন্যা ও এক ভাই রেখে গেছেন।

* * *

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বারাসাত জেলা প্রচারক রবিকিঙ্কর ঘোষের মাতৃদেবী সরমা ঘোষ গত ১ জুলাই বীরভূম জেলার মামুদপুর গ্রামে তাঁর বড় মেয়ের বাড়িতে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর।

তিনি ৩ পুত্র, ২ কন্যা এবং নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

সবার প্রিয়
বিল্লদা ®
চানাচুর
'বিল্লদাকুঞ্জ'
কালিকাপুর, বোলপুর,
জেলা : বীরভূম
ফোন : ০৩৪৬৩ ২৫২৪৪৭
মো : ৯৪৩৪৩০৬৭৯৬ /৯২৩৩১৮৯১৭৯

SMALL INVESTMENT TO FULFILL OUR FINANCIAL GOALS......
SIP
SYSTEMATIC INVESTMENT PLAN IN EQUITY MUTUAL FUNDS
What is SIP?
Like a recurring deposit, Systematic Investment Plan Works on the Principle of regular investments, where you put aside a small amount every month. What's more, you have the opportunity to invest in a Mutual Fund by making small periodic investments in place of a huge one-time investment. In other words, **Systematic Investment Plan** has brought mutual fund within the reach of common man as it enables anyone to invest with a small amount on regular basis.

START EARLY + INVEST REGULARLY +
INVEST FOR LONG TERM = WEALTH CREATION
DRS INVESTMENT
Contact : 9830372090, 9748978406
Email : drsinvestment@gmail.com
PMS | Mutual Fund | Insurance | Mediclaim | Fixed Deposit | Bond

ক্রীড়াবিজ্ঞানই সফলতার চাবিকাঠি

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

ছেলেটির চোখে এরকাশ স্বপ্ন। বয়স মাত্র এগারো। একদিন বিশ্ববিখ্যাত লং জাম্পার হয়ে অলিম্পিক পোডিয়ামে গিয়ে দাঁড়াবে। শুরু করল কঠোর অনুশীলন। কিন্তু একটা স্তরের পরে আর এগোনো সম্ভব হচ্ছিল না। টানা ১৫ বছর বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় নেমে রেকর্ড দূরের কথা ৭.৯ মিটারের বেশি লাফাতেই হিমশিম খেয়ে যাচ্ছিল। তারপর হঠাৎ সবাইকে চমকে দিয়ে বিশ্ব প্রতিযোগিতায় নেমে অতি-মাত্রিক কীর্তি করে বিশ্ববাসীকে চমকে দিলেন। কিংবদন্তী বব বিমনের রেকর্ড ভেঙে নতুন বিশ্বরেকর্ড করল ছেলেটি। ছেলেটি আর কেউ নয় মাইক পাওলে। বব বিমনের অতিমাত্রিক রেকর্ড ভাঙতে সফল হয়েছিলেন পাওলে কীসের জোরে? পাওয়েল নিজেই রহস্যভেদ করে জানিয়েছেন মাঝের কয়েকবছর রোজ ক্রীড়াবিজ্ঞান কেন্দ্রে গিয়ে নিয়ম করে নানা ধরনের বিজ্ঞানসম্মত অনুশীলন করে গোটা শরীরের সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গের শক্তি ও সহনশীলতা অনেকাংশে বাড়িয়ে তুলেছিলেন। যার জোরেই বিশ্বরেকর্ড ভেঙে নয়া কীর্তির অধিকারী হয়ে যান।

মাইক পাওলে

বেশ কয়েকদশক ধরেই বিশ্বের উন্নত দেশগুলি ক্রীড়া ও শরীরচর্চার বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে অভাবনীয় কীর্তিকল্প রচনা করে চলেছে তাতে মূল চালিকাশক্তি এই ক্রীড়াবিজ্ঞান। আজ গোটা দুনিয়ার সব দেশে এর অপরিসীম গুরুত্ব দেখা যাচ্ছে। ভারতে স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া বা সাইয়ের প্রতিটি কেন্দ্রে ক্রীড়াবিজ্ঞান নিয়ে নিয়মিত গবেষণা হচ্ছে। দেশে অন্যান্য ক্রীড়াসংস্কৃতি তাদের যাবতীয় কর্মসূচির মধ্যে ক্রীড়াবিজ্ঞানকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। তার সুফল পাওয়া যাচ্ছে নানা খেলার আন্তর্জাতিক আসরে।

সম্প্রতি লন্ডনে চ্যাম্পিয়নস ট্রফি হকিতে ভারত যে ঐতিহ্য ও গৌরবের খানিকটা পুনরুদ্ধার করতে পেরেছে রানার্স হওয়ার দৌলতে তার মূলে কিন্তু খেলোয়াড়দের ফিটনেস, স্ট্যামিনা। একমাত্র ফিটনেস ও স্ট্যামিনাতেই মার খেয়ে অস্ট্রেলিয়া, জার্মানি, হল্যান্ড, স্পেনের মতো দলগুলির সঙ্গে ভারতীয়রা এঁটে উঠতে না পারায় তিন দশক ধরে কোনো বৃহৎ আন্তর্জাতিক আসরে সাফল্য ধরা দেয়নি। লন্ডনে বিশ্বের সেরা ৬ দলের টুর্নামেন্টে রানার্স হয়ে ভারত দুনিয়াকে জানিয়ে দিয়েছে আবার উঠে আসছে ভারতীয় হকি। অলিম্পিকের আগে এটাই সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি।

শুধু হকি নয়, ব্যাডমিন্টন, টেনিস, শ্যুটিং, গল্ফের মতো খেলাগুলিতে ভারতীয়রা বর্তমানে সমানতালে পাল্লা দিচ্ছে পাশ্চাত্য দুনিয়ার সঙ্গে। শুধুমাত্র স্কিল ও টেকনিক নয়, পাওয়ারের ক্ষেত্রেও শক্তিশালী শারীরিক কাঠামোর অধিকারী ইউরোপ, আমেরিকা বা অন্যান্য মহাদেশের ছেলেমেয়েদের রীতিমতো কাউন্টার করছে ভারতীয়রা। ক্রীড়াবিজ্ঞানের উন্নতি ও সুষম ব্যবহারই একমাত্র কার্যকারণ। পাশ্চাত্য দুনিয়া অলিম্পিককে সামনে রেখে অনেক আগে থেকেই এর গুরুত্ব মর্ম উপলব্ধি করে সব স্তরে কাজকর্ম ছড়িয়ে দিয়েছিল। তাই প্রত্যেক অলিম্পিকে সেই দুনিয়ার সব দেশ মুঠো মুঠো পদক তুলেছে। ভারতবর্ষ হাঁ করে দেখে গেছে। এখন এদেশেও যথেষ্ট ভাল কাজ ও গবেষণা হচ্ছে। তাই অদূর ভবিষ্যতে ভারতও সব খেলায় এক উন্নত রাষ্ট্র হয়ে মাথা তুলে দাঁড়াবে।

ক্রীড়াবিজ্ঞানের মূলত তিনটি স্তর। (১) প্রমোশনাল, (২) প্রিভেনটিভ, (৩) কিউরেটিভ অ্যাসপেক্ট। প্রমোশনাল শিশু প্রতিভাদের সঠিক খেলা নির্বাচনে সাহায্য করে। পারফরমেন্সের অবনতি যাতে না হয় তা দেখে প্রিভেনটিভ অ্যাসপেক্ট। আর চোট আঘাত থেকে মুক্ত রেখে শতকরা একশো ভাগ সুস্থ অবস্থায় মাঠে নেমে লড়াই করার ক্ষেত্রে কিউরেটিভ অ্যাসপেক্টের গুরুত্ব। তাছাড়া খেলোয়াড়দের মোটিভেশন, টেম্পারামেন্ট-সহ আবেগ, সাহস, ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও কোচ, ট্রেনারের সঙ্গে ক্রীড়াবিজ্ঞান বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন। খেলোয়াড়দের খাদ্যাভ্যাস, তারা কতটা পরিশ্রম করবে, কতটাই বা তাদের বিশ্রাম ও ঘুমের প্রয়োজন প্রভৃতি নিত্যনৈমিত্তিক যাবতীয় অভ্যাসের রূপরেখা তৈরি করে ক্রীড়াবিজ্ঞান। ক্রীড়াবিজ্ঞান ব্যাপারটির উদ্ভব ১৮৮৩ সালে। আর ১৮৯৬-তে প্রথম আধুনিক অলিম্পিকের সময়ই তার গুরুত্ব ও প্রভাব উপলব্ধি করে অংশগ্রহণকারী ২০টি দেশ। তারপর থেকেই নিরন্তর গবেষণা ও নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে আজ ক্রীড়াবিজ্ঞান এক স্বয়ংসম্পূর্ণ অবস্থান তৈরি করে নিয়েছে প্রতিটি দেশের সামাজিক জীবনচর্যায়।

তাই শুধুমাত্র অ্যাথলিট ক্রীড়াবিদরাই নন, সমস্ত ক্ষেত্রের ও সমস্ত স্তরের মানুষ সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবন ও জীবিকার নিমিত্ত যোগ-প্রাণায়ামের মতো ক্রীড়াবিজ্ঞানকেও প্রতিটি কাজের আবশ্যিক অঙ্গ করে তুলেছে। ▮

শব্দরূপ-৭৯৫ শামাপ্রসাদ দাশ

১			২	৩	■	■	৪
৪	■	■	৫		■	■	
	■	■	৬		■	৭	
৮	৯	■	■	১০			■
■	১১		১২	■	■	১৩	১৪
১৫		■	১৬	১৭	■	■	
	■	■	১৮		■	■	
	■	■	১৯				

সূত্র :

পাশাপাশি : ১. পতনের মূল, **৫.** প্রকৃতির তিনগুণের অন্যতম, **৬.** '— কোথা নাহি জানে' (রবীন্দ্র), **৭.** স্বভাব, মর্যাদা, **৮.** '— শুভ আশিস মাগে', **১০.** সেচন, বর্ষণ, **১১.** ক্ষেত্রপরিমাপ, **১৩.** 'তুমি — নীরবে', **১৫.** রবীন্দ্র উপন্যাস, **১৬.** দু'দিকেই গর্ত, **১৮.** টানলে মাথা আসে, **১৯.** ছদ্মনামে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

উপর-নীচ : ১. সাদা রং, শ্বেতবর্ণ, **২.** খেমটানাচ, **৩.** '— প্রেম নিকষিত হেম', **৪.** স্বাধীন হিন্দুরাষ্ট্র হিসেবে পরিচিত ছিল, **৭.** বায়ুতাড়িত জলকণা, **৯.** বড়ো ও বাহারি নৌকো, **১২.** শ্লোক রচনাকারী, **১৪.** দিনের আলো থাকায়, **১৫.** সুন্দরবন অঞ্চলের নদী, **১৭.** জাপানের দ্বীপ।

সমাধান
শব্দরূপ-৭৯২
সঠিক উত্তরদাতা
সুশীল কয়াল
কলকাতা-৬
সহদেব পাল
ফরাক্কা, মুর্শিদাবাদ

অ	ছি	লা	■	অ	গ্র	দা	নী
ছি	■	ই	জ্জ	ত	■	■	■
■	ম	ন	■	নু	ড়	কু	ত
■	ধু	■	■	■	■	উ	■
■	মে	■	■	■	■	মি	■
অ	হ	মি	কা	■	মা	ত	■
■	■	■	মি	ছি	ল	■	না
ম	ন্দা	কি	নী	■	পো	লি	ও

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়।
খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

□ ৭৯৫ সংখ্যার সমাধান আগামী ১ আগস্ট ২০১৬ সংখ্যায়

প্রেরণার পাথেয়

স্বরাজ্যের ব্যাখ্যায় প্রধানত তিনটি কথা এসে পড়ে। প্রথম কথা, রাজ্য সেই লোকেদের দ্বারা পরিচালিত হবে যারা রাষ্ট্রের অঙ্গস্বরূপ। দ্বিতীয় কথা, রাজ্যকে রাষ্ট্রের হিতে চলতে হবে। অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় হিতের জন্য নীতিনির্ধারণ করতে হবে। তৃতীয় কথা, রাষ্ট্রের হিত সাধনের ক্ষমতা রাজ্যের নিজস্ব হতে হবে। অর্থাৎ স্বাবলম্বন বিনা স্বরাজ্যের কল্পনা করাই ভুল। রাজ্য তার রাষ্ট্রের অনুঘটক রূপে কাজ করার পরও যদি আর্থিক বা বৈদেশিক বিষয়ে অন্য রাষ্ট্রের লেজুড় হয়ে যায় বা চাপে পড়ে যায় তাহলে স্বারাজ্য নিরর্থক হয়ে যায়। সুরক্ষা বিষয়ে যদি রাজ্য আত্মনির্ভর না হয়, নীতিনির্ধারণে যদি স্বাধীন না হয় এবং আর্থিক যোজনায় যদি স্বয়ং পরিপূর্ণ না হয় তাহলে রাষ্ট্রের পক্ষে তা অনিষ্টকর হয়ে পড়ে। এরকম পরাবলম্বী রাজ্যের ধ্বংস সাধন হয়।

গণতন্ত্রের একটি ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, তর্ক বিতর্কের মধ্যে দিয়ে চলা দেশ। 'বাদে বাদে জায়তে তত্ত্ববোধঃ'—আমাদের পুরনো কথা। কিন্তু তত্ত্ববোধ তখনই হবে যখন অন্যের কথা সম্মানের সঙ্গে শুনে তার সারাংশ গ্রহণ করার ইচ্ছা থাকবে। যদি অন্যের কথা শোনার বা বোঝার ধৈর্য না থাকে, শুধু নিজের মত চাপিয়ে দেওয়ার মানসিকতা থাকে তাহলে 'বাদে বাদে জায়তে কণ্ঠশোষঃ'-এ পর্যবসিত হবে। ভলতেয়ার যখন বলেন, । 'আমি তোমার কথা সত্য বলে মানি না, কিন্তু আমি আমার কথা বলার জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করবো, তখন তা 'কণ্ঠশোষঃ'-এর অধিকারকেই স্বীকার করা হয়। ভারতীয় সংস্কৃতিতে বাদ-বিবাদকে 'তত্ত্ববোধ'-এর উপকরণ হিসেবে দেখা হয়। আমাদের মত হলো, সত্য একাঙ্গি নয়, বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সত্যকে দেখা, যাচাই করা ও অনুভব করা যায়। এজন্য বিবিধতার মধ্যে সমন্বয় সাধনের দ্বারা যিনি সমগ্রকে অনুভব করতে পারেন তিনি তত্ত্বদর্শী এবং জ্ঞাতা।

(পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় ব্যক্তি-দর্শন থেকে)

।। চিত্রকথা।। বিক্রমাদিত্য।। ২৮

বিদ্যাভারতীর বিদ্যালয়ে বাড়ছে অ-হিন্দু ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ উত্তরপ্রদেশে বিদ্যাভারতী পরিচালিত সরস্বতী শিশু মন্দির ও সরস্বতী বিদ্যামন্দিরগুলিতে বেশ উল্লেখযোগ্য হারেই বেড়েছে অ-হিন্দু ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা। এরাজ্যে বিদ্যাভারতীর ১২০০ বিদ্যালয়ে প্রায় ৭ হাজার মুসলমান ছেলেমেয়ে পড়াশোনা করছে। বিদ্যালয়ের হিন্দু শিক্ষার্থীদের মতো অ-হিন্দু শিক্ষার্থীরাও সংস্কৃত শ্লোক এবং ভোজনমন্ত্র পাঠ করে। এ বিষয়ে তাদের বা অভিভাবকদের কোনো আপত্তি নেই। সূর্য নমস্কার ও বৈদিক মন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে বন্দেমাতরম্ গেয়ে বিদ্যালয় শুরু হয়। শুধু পড়াশুনা নয়, জাতীয়স্তরের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এবং যুব কমনওয়েলথ গেমস-এ মহম্মদ আকিব, আফতাব আলম, ইজাজ আহমদ, গুফরানুদ্দিন এবং মোহম্মদ আকরাম মেডেল জিতেছে বলে জানিয়েছেন বিদ্যা ভারতীর স্টেট ইন্সপেক্টর চিন্তামণি সিং। বর্তমানে অ-হিন্দু ৪,৬৭২ জন ছাত্র এবং ২,২১৮ জন ছাত্রী একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত বিদ্যাভারতী পরিচালিত স্কুলগুলিতে পড়াশোনা করছে। জানা গেছে, বিদ্যাভারতী সম্প্রতি আটজন অ-হিন্দু শিক্ষক নিয়োগ করেছে। কর্তৃপক্ষের মতে, শিক্ষার মানই হচ্ছে অ-হিন্দু ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধির প্রধান কারণ। যার ফলে মুসলমান বাবা-মায়েরা তাদের ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠান। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত মাসেই অসমে বিদ্যাভারতী পরিচালিত বিদ্যালয়ের এক মুসলমান ছাত্র উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেছে।

লেজার প্রাচীরে মুড়ে ফেলা হবে বাংলাদেশ সীমান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ভারত-বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী অঞ্চলের কোনো কোনো জায়গায় নদী থাকায় সেখানে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া সম্ভব নয়। সেইজন্যে এই জায়গাগুলি চিহ্নিত করে লেজার প্রাচীর দিয়ে মুড়ে ফেলার সিদ্ধান্ত নিল প্রতিরক্ষা মন্ত্রক। অত্যাধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর এই ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হলো, কোনো সন্ত্রাসবাদী নদী পেরিয়ে ভারতে আসার চেষ্টা করলে সঙ্গে সঙ্গে সাইরেন বেজে উঠবে এবং অদৃশ্য লেজার রশ্মি তাকে মারাত্মকভাবে ঘায়েল করবে। সিসিটিভি তুলে রাখবে পুরো ঘটনার ছবি। আই এস জঙ্গিদের হামলা যেভাবে বাড়ছে তাতে প্রতিরক্ষা মন্ত্রক মনে করছে ছোটবড়ো অসংখ্য নদী সংবলিত ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতার বা ইনসাস রাইফেল হাতে প্রহরার চেয়ে এই ব্যবস্থা আরও বেশি কার্যকর হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ভারতীয় সীমান্তরক্ষাবাহিনী দু'বছর আগে এই ব্যবস্থা লাগু করার প্রস্তাব দিয়েছিল। কাশ্মীর সীমান্তে ইতিমধ্যেই লাগু করা সম্ভব হয়েছে। এবার পালা ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের।

মন্দির অপবিত্র করা বৌদ্ধিক সন্ত্রাসের নজির

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ জম্মু-কাশ্মীরে পরপর ঘটে যাওয়া মন্দির অপবিত্র করার ঘটনাকে রাজ্য প্রশাসন বৌদ্ধিক সন্ত্রাস বলে

অভিহিত করেছে। বলা হয়েছে সীমান্তপার সন্ত্রাসেরই নতুন রূপ এই বৌদ্ধিক সন্ত্রাস। প্রথমে কয়েকটি ধর্মীয় সংগঠন এবং পরে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে আলাপচারিতায় জম্মুর ডেপুটি পুলিশ কমিশনার সিমরনদীপ সিং বলেছেন, 'সাম্প্রতিককালে জম্মু শহরে যা হচ্ছে তাকে সাধারণ অপরাধ ভাবলে ভুল হবে। আড়ালে এমন কেউ আছে যারা সমাজের মেরুকরণ ঘটিয়ে আরও বড় আঘাত করতে চায়।' এরপরেই উঠে আসে বৌদ্ধিক সন্ত্রাসের তত্ত্ব। তিনি বলেন, 'সাধারণত সন্ত্রাসবাদীরা পাকিস্তান থেকে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে ঢোকে। তাদের গতিবিধি যদি দৈবাৎ পুলিশ জেনে ফেলে তখনই তারা খুনখারাবি শুরু করে। অন্তত পাঁচ-ছ'জনকে খুন করতে পারলে তাকে সফল বলে ধরা হয়। কিন্তু বৌদ্ধিক সন্ত্রাসে পাকিস্তান থেকে ভারতে আসার দরকার নেই।

ভারতের অল্পবয়েসী ছেলেদের দারিদ্র্য, ড্রাগের নেশা বা অন্য কোনো দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে তাদের ফাঁদে ফেলতে পারলেই হলো।

এক্ষেত্রে যোগাযোগের মাধ্যম ইন্টারনেট। একবার বোঝাপড়া হয়ে গেলে দূর থেকে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ পরিচালনা করা যায়।' বৌদ্ধিক সন্ত্রাসের উদাহরণ দিতে গিয়ে তিনি সম্প্রতি জানিপুরা মন্দির অশুচি করার ঘটনার কথা বলেন। এই ঘটনায় একজন মানসিক ভারসাম্যহীন যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এদিকে অন্য একটি ঘটনায় জম্মু- কাশ্মীরের রাজনৈতিক মহল এখন যথেষ্ট সরগরম। জম্মুর রূপনগর এবং নানক নগর মন্দির অশুচি করার ঘটনায় মূল অভিযুক্ত একুশ বছর বয়েসী সৈয়দ শাহ্ বুখারিকে তার নিজের বাড়িতে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। দু' বছর আগে ত্রিকূটনগর মন্দিরের শিবলিঙ্গ পোড়ানোর অভিযোগও রয়েছে তার বিরুদ্ধে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সৈয়দ শাহ্ বুখারি প্রাক্তন ন্যাশনাল কনফারেন্স বিধায়ক মুস্তাক বুখারির ভাইপো। আইন পাঠরত সৈয়দ শাহ্ বুখারির নাকে মুখে রক্তের চিহ্ন পাওয়া গেছে। চিকিৎসকদের অনুমান উচ্চ রক্তচাপ জনিত কারণে হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি মারা গেছেন। তাঁরা এও জানিয়েছেন বুখারি মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন।

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57
11 July - 2016 - Rs. 10.00,

With Best
Compliments from

A
Well
Wisher

S.B.